NATAK, KABYA, UPANYAS

BA [Bengali]

General Paper

Third Semester

Paper-3

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Sukhendu Biswas

Karimpur, Pannadevi College

Author: Dr. Aniruddha Biswas

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই - ম্যাপিং
প্রথম একক : নীলদর্পণ -দীনবন্ধু মিত্র	(পৃষ্ঠা 1-24)
দ্বিতীয় একক : ডাকঘর - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(পৃষ্ঠা 25 - 48)
তৃতীয় একক :কল্পনা -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(পৃষ্ঠা 49 - 67)
চতুর্থ একক :রাজর্ষি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(পৃষ্ঠা 69 - 92)

সূচীপত্র

প্রথম একক : নীলদর্পণ - দীনবন্ধু মিত্র (পৃষ্ঠা 1-24)

১.১ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

১.২ 'নীলদর্পণ' - এর পটভুমি

১.৩ নামকরন

১.৪ গঠন

১.৫ সংলাপ

১.৬ নাটক অথবা নাট্যচিত্র

১.৭ উদ্দেশ্যমূলক রচনা

১.৮ ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গ

১.৯ মেলোড্রামা / মৃত্যুর মিছিল

১.১০ নায়ক বিচার

১.১১ হাস্যরস

১.১২ ভদ্রেতর চরিত্র

দ্বিতীয় একক : ডাকঘর - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃষ্ঠা 25 - 48)

২.১ নাট্যকার রীন্দ্রনাথ

২.২ 'ডাকঘর' নাটকের মূল ভাব

২.৩ 'ডাকঘর' : শ্রেণী বিচার

২.৪ 'ডাকঘর' : চরিত্র পর্যালোচনা

২.৫ 'ডাকঘর' : নামকরণ

২.৬ 'ডাকঘর' : সংলাপ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তৃতীয় একক: কল্পনা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃষ্ঠা 49 - 67)

৩.১ দুঃসময়

৩.২ বর্ষামঙ্গল

৩.৩ স্বপ্ন

৩.৪ মদনভস্মের পর

৩.৫ বর্ষশেষ

৩.৬ বৈশাখ

চতুর্থ একক : রাজর্ষি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পৃষ্ঠা 69 - 92)

৪.১. ভুমিকা

৪.২. রচনাকাল

৪.৩. 'রাজর্ষি' রচনার প্রেক্ষাপট

৪.৪. রাজর্ষি: গোত্র নির্ণয়

৪.৫. রাজর্ষি: নামকরন

৪.৬ চরিত্র :ক. গোবিন্দমাণিক্য

খ. রঘুপতি

গ. নক্ষত্ররায়

ঘ. জয়সিংহ

ঙ. বিল্বন ঠাকুর

ভূমিকা

টিপ্পনী

এই গ্রন্থটিতে যে চারটি বিষয় নির্বাচিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি বিষয় কোনো না কোনো দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । বাংলা সাহিত্য এই চারটি বিষয়ই উল্লেখযোগ্য । চারটি বিষয় হলো নীলদর্পণ, ডাকঘর, রাজর্ষি এবং কল্পনা । নীলদর্পণ বাদে বাকি তিনটের রচনাকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অর্থাৎ এই পাঠমালার সিংহভাগ জুড়ে আছে রবীন্দ্রসাহিত্য।

প্রথমেই আসা যাক নীলদর্পণ প্রসঙ্গে । নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের অমর সৃষ্টি নীলদর্পণ । নাটকটি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত বাংলা নাটকের তখন হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা। সবে মধুসূদন দত্ত শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী আর দুটি প্রহসন, একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ লিখেছেন । তার আগে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার বলতে উমেশচন্দ্র মিত্র ও রামনারায়ণ তর্করত্ন । এই রকম একটা সময় দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব নীলদর্পণ নিয়ে।

বাংলায় তখন কোম্পানীর শাসন চলছে । বলা ভালো শাসনের নাম শোষণ চলছে । গোরা সাহেবরা বাংলার চাষবাসকে রীতিমত ধংস করে দিচ্ছে । যে নীল চাষ করলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়, সেই নীল চাষ করাচ্ছে কৃষকদের দিয়ে । খাবারের সংস্থান এক প্রকার বন্ধ । চাষীরা নীল চাষে অস্বীকৃত হলে জোর করে কিংবা অত্যাচার করে নীল চাষে বাধ্য করছে । বাড়ির মেয়েদের ওপর নেমে আসছে অবর্ণনীয় অত্যাচার । নাট্যকার দীনবন্ধু এই জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে লিখলেন 'নীলদর্পণ' নাটক । বাংলা নাটকের সূচনা পর্বে এমন বিষয় নিয়ে লেখা নাটক বাংলাদেশে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করলো । নড়েচড়ে বসলো শাসক , জনতা ও । এ নাটক বন্ধ করার চেষ্টা করলো । ফাদার লং সাহেবের কারাদন্ড হলো নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদের জন্য । নাট্যকার দীনবন্ধু ছদ্মনামে লিখলেন এ নাটক । তাই তার কিছু হলো না বটে, কিন্তু চাকরিতে যোগ্যতা অনুযায়ী পদ পেলেন না।

যাইহোক সূচনা পর্বের এই কালজয়ী নাটক মঞ্চ সফল কিন্তু শিল্প সফল নয় ততটা। নাটকটি পড়লে এই বিষয়টি জানা যাবে। শুধু তাই নয় ভাষায় ব্যবহার কেমন ছিল নাটকে, তাও বোঝা যাবে। সর্বোপরি নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যাবে। এ দিক থেকে নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ । বাঙালীর স্বদেশ চেতনা জাগরিত করতে অনেকখানি ভূমিকা নিয়েছিল নাটকটি। এই সব কারণে নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ।

এবার আসা যাক রবীন্দ্র সাহিত্যে। প্রথমে ডাকঘরের কথা বলা যেতে পারে।

টিপ্পনী

নাটকটি কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। এখানে কবি সুদূরের পিয়াসী। বিশ্বাত্মার সঙ্গে মানবত্মার মিলনের আহ্বাণ আছে এখানে। বিশ্বদর্শনের উন্মুখতা থেকে জন্ম নিয়েছে মহাজগতের সঙ্গে মিলনেচ্ছা। নাটকটি প্রতীকধর্মী নাটক।

চিত্রাকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু কল্পনা কোনো অংশে চিত্রার চেয়ে অনূন্য নয়। এ কাব্যেই প্রথম দেখা যায় আধ্যাত্মিকতা ও অন্তঃচেতনার মেলবন্ধন। এই দুয়ে মিলে কাব্যটি চিত্রার আগেই স্থান পাওয়ার দাবি রাখে কল্পনায় কবিমনের উত্তুঙ্গ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবিতাগুলি নিখুঁত সৌন্দর্য্যের সার্থক উদাহরন।

রাজর্ষি উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের রচনা। একটা বঙ্কিমী শৈলীর অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় এই উপন্যাসে। উপন্যাসটি ঐতিহাসিক না হয়েও ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার এইটেই তার প্রথম ও শেষ চেষ্টা। উপন্যাস হিসেবে রাজর্ষি খুব সাহিত্য গুণসম্পন্ন নয়। তবে এই উপন্যাসে পরবর্তী কালের ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের পদচারণা শোনা যায়। সেদিক থেকে এর গুরুত্ব কম নয়।

প্রথম একক

নীলদর্পণ- দীনবন্ধু মিত্র

টিপ্পনী

১.১ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

১.২ 'নীলদর্পণ' - এর পটভুমি

১.৩ নামকরন

১.৪ গঠন

১.৫ সংলাপ

১.৬ নাটক অথবা নাট্যচিত্র

১.৭ উদ্দেশ্যমূলক রচনা

১.৮ ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গ

১.৯ মেলোড্রামা / মৃত্যুর মিছিল

১.১০ নায়ক বিচার

১.১১ হাস্যরস

১.১২ ভদ্রেতর চরিত্র

১.১ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

মাত্র ৪৪(চুয়াল্লিশ)বছরের জীবন সীমা। তা সত্ত্বেও কালজয়ী বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র। এক প্রতিবাদী কণ্ঠ। ১২৩৬ সনের চৈত্র মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্ম। প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ গ্রামের পাঠশালাতে। তারপর হেয়ার স্কুল। পরে হিন্দু কলেজ। ১৮৫৩সালে শিক্ষকতা কর্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। আনুমানিক ১৮৫৫ সালে পাটনায় পোষ্টমাষ্টার পদে যোগ দেন। পদোন্নতি হলে তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইনস্পেকটিং পোষ্টমাষ্টার হিসেবে নিযুক্ত হন। ডাক বিভাগের কাজে বিহার, বাংলা ও উড়িষার বহুস্থানে ঘুরতে হয়। লুসাই যুদ্ধের (১৮৭১) সময় তাঁকে কাছড়ে যেতে হয়। প্রচন্ড পরিশ্রমে তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। চল্লিশ বছর বয়সের কিছু পরপর তিনি বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হন। ১৮৭৩ সালের ১লা নভেম্বর

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
1

তাঁর জীবনাবসান হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের'সংবাদ প্রভাকর' - এ দীনবন্ধুর লেখালেখির সূত্রপাত। গুপ্তকবির 'রায় বাহাদুর' খেতাব পাওয়া শিষ্যের প্রথম রচনা 'মানব চরিত্র' নামে কবিতা। এছাড়া 'সুরধুনী কাব' (১৮৭১), 'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২) ও তাঁর রচিত। তবে কবিতা নয় নাটকই তাঁকে কালজয়ী করেছে।

টিপ্পনী

তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। এছাড়া তিনি বেশকিছু প্রহসন লেখেন তা হল - 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২), 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), কমলে কামিনী' (১৮৭৩) প্রভৃতি।

'নীলদর্পণ'ই তাঁর সবচাইতে জনপ্রিয় নাটক। নাটকটি ১৭৮২ শকাব্দের ২রা আশ্বিন, ইংরেজি ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঢাকাতেই প্রথম অভিনীত হয়। পরেন্যাশানাল থিয়েটার ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর এই নাটক দিয়ে তার দ্বারোদ্‌ঘাটন করে। ১৯০৮ সালে নাটকটি রাজদ্রোহীমূলক বলে অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১.২. 'নীলদর্পণ' এর পটভূমি

শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ নীলচাষের ক্ষেত্রে খুবই আদর্শ। ইংল্যান্ডে নীলের খুব চাহিদা থাকায় সাহেবরা এ দেশ নীলচাষ চালু করলেন। বাংলার কৃষকদের জোর করে দাদন নিতে বাধ্য করে নীলকরেরা নীলচাষ শুরু করেন। তাদের লাভের মাত্রাও এতে খুব বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের লোভও। এর ফলে চাষিদের চাষবাস বন্ধ করে দিয়ে কোথাও সামান্য টাকায় কোথাও বা কোন টাকা পয়সা না দিয়েই - জোর করে নীল বুনতে বাধ্য করল। কেউ যদি সামান্যতম বিরোধীতা করত, তা হলে তার ওপর দৈহিক অত্যাচার, অর্থদন্ড, বিনা বিচারে কুঠিতে আটক করে রাখত। পারিবারিক সম্মানহানি ও করত।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
2

আশানুরূপ ফসলের জন্য নীলচাষে প্রজাদের বাধ্য করা, সাহেবদের জমিদারী ও তালুকদায়ী ক্রয়, কৃষকদের বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটান। কখনো কখনো কুটিতে কয়েদ রাখ - এর ফলে দেশে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিল। এদিকে নীলকরগণ কেউ কেউ অ্যাসিট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটে আসীন হলে প্রজাদের দুঃখ আরো বাড়ল। নীলকরেরা দাদন নেওয়া চাষিদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করত। টাকা পরিশোধের সুযোগ তাদেরদেওয়া হত না। জমির মাপে ও ফসলের মাপে তাদের প্রতারিত করা হত। নালিশ করলে সাজা হত না, কেননা ইংরেজ হকিমরা ইংরেজ নীলকরদের শাসন করত না।

নীলচাষের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রথম নীলচাষের প্রবর্তন করেন মঁসিয়ে ল্যুই বোনার নামক এক ফরাসীব্যাক্তি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। হুগলির তালভাঙ্গায় প্রথম তিনি কুঠি তৈরী করেন। পরে তা চন্দননগরের গোঁদল পাড়াতে তৈরী হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রিন্সেট নামক নীলকর সাহেবের সঙ্গে ১৭৭৯ সালে নীল সরবরাহের চুক্তি করে। প্রথমদিকে নীলকরদের ৫০ থেকে ৭৫ বিঘার বেশি জমি নীলচাষেরজন্য দেওয়া হত না। পরে তারা চাষীদের লোভ দেখিয়ে কুঠির সংলগ্ন জমি দখল করে ব্যাপকভাবে নীলচাষ শুরু করে। টাকার লোভে দেশীয় জমিদাররাও নীলচাষে উৎসাহিত হয়। এরাও ইংরেজদের থেকে কোন অংশে কম অত্যাচার করে নি।

দীনবন্ধু মিত্র কর্মসূত্রে নানান জায়গাব ঘুরে বেড়ান। তখন তিনি প্রজাদের এই দুরাবস্থা লক্ষ্য করেন। এরই ফল 'নীলদর্পণ' নাটকটি শোনা যায় এর ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধূসূদন দত্ত এবং প্রকাশ করেন পাদরি জেমস্ লঙ। এই কারনে লঙ সাহেবের একমাস কারাদন্ড ও হাজার টাকা জরিমানার হয়। জরিমানার টাকা দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। আরো শোনা যায় , এইজন্য নাকি মধুসূদনকে সরকারী চাকরি ছাড়তে হয়।

এদিকে ইংরেজের অত্যাচারের ফলে সাধারণ প্রজাদে মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়তে থাকে। রাজসরকারের তা মাথা ব্যাথার কারণ হয়। তখন সাহেবরা এই বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার জন্য জেলাগুলিকে বেশি সংখ্যক মহাকুমায় বিভক্ত করে আদালত নির্মাণ করে এবং আরো বেশি বেশি করে সৈন্য মোতায়েন করে। প্রজাদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা দায়ের করে নীলকরেরা তাদের নিঃস্ব করে দেয়। শেষপর্যন্ত ১৮৬৮ সালে 'নীলচুক্তি আইন' রদ করা হয়। আর ১৮৯২ সালে রাসায়নিক ভাবে নিল তৈরী করা গেলে নীলচাষ চিরতরে বন্ধ হয়। এক দুঃখয়, যন্ত্রণাময় ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে।

টিপ্পনী

১.৩.নীলদর্পণ : নামকরণ

সাহিত্যে নামকরণ সবসময়ও গুরুত্বপূর্ন। কারণ নামকরনের মধ্যে দিয়ে ঐ সাহিত্যকর্মের সারসত্তার সন্ধান মেলে। অন্তত তার একটা আভাস মেলে। নাটকের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম নয় । 'নীলদর্পণ' নাটকটির নামকরণের মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের মনোভাব পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই আন্দাজ করে নেন। 'নীলদর্পণ' এর দর্পন শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই নাটকের ভূমিকার দিকে নজর করলে দেখা যায়, নাট্যকার বলেছেন -

স্ব-সহায়ক সামগ্রী

"নীলকরনিকরকরে নীল দর্পন অর্পন করিলাম। এক্ষনে তাঁহারা

নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা -কলঙ্ক - তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার শ্বেতচন্দন ধারণ করুণ, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।....."

এই বক্তব্যেই 'দর্পণ' শব্দের মুল অর্থ প্রকাশিত । নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্বক' এই শব্দবন্ধেই বলে দেওয়া হয়েছে আসল কথা। ইংরেজ নীলকরেরা নিজেদের অত্যাচারের কাহিনী, কুকর্ম এই নাটক রূপ দর্পণে দেখে বুঝুক তারা কি মহাপাতকের কাজ করেছে। এই নাটক আসলে তাদের প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

টিপ্পনী

এই 'দর্পণ' শব্দটির নানান অর্থব্যঞ্জনা। সে সময়ের কিছু সংবাদপত্রের নাম 'দর্পণ' দিয়ে ছিল । যেমন -'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' 'মহাজনদর্পণ', 'বিদ্যাদর্পণ' ইত্যাদি। শুধু তাই নয় সে সময়ের সেই সংবাদ পত্রগুলিতে নীতিবাক্য বা আদর্শবাণী থাকতো যাতে তার নিজস্ব চরিত্রটি ধরা পড়ত । 'নীলদর্পণ' এও নাট্যকার সে পথ অনুসরণ করে লিখেছেন -

"নীলদর্পণং নাটকং নীলকর বিষধর-দংশন কাতর - প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেন কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং"

সাময়িক পত্র যেমন সংবাদে প্রকৃত দর্পণ, তেমনি 'নীলদর্পণ' ও যেন নীলকরদের অত্যাচারের দর্পণ। এই অর্থে 'দর্পণ' সেখান থেকেই 'নীলদর্পণ' এই দর্পণে যারামুখ দেখবন তারা ইংরেজ,, বিজাতীয় । এদেশের তারা কেউ নয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই কারণেই নাটকটি অনুবাদ করা হয়। তবে যাই হোক এই বিদেশী দুই ধরনের - অত্যাচারী, দুবৃত্ত নীলকর সাহেবরা আর দ্বিতীয় শ্রেণী মানবতাবাদী ভালো ইংরেজরা। এই ভালো ইংরেজদেরকেই এ দর্পণ সমর্পণ করেছেন নাট্যকার। সে কারনে অত্যাচারের নিখুঁত চিত্র চাই । সেই চিত্র ; প্রতিবিম্ব দেখে যেন তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়। তাদের শুভবোধ জাগ্রত হয়। এটিই ছিল নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
4

এছাড়া নাটকে উল্লিখিত প্রজাদের সংলাপ থেকে বোঝা যায়, নীলচাষের সম্পূর্ন্য বিলুপ্তি নয়, প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার বন্ধ করাই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই কারণে দীনবন্ধু চরিত্রদের মুখ দিয়ে বারে বারে বলিয়েছেন গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা প্রজারাই যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তাহলে নীলচাষ করবে কারা। অতএব, ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেই প্রজাপীড়ন বন্ধ করুক - এমনই বার্তা কৌশলে নাট্যকার দেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সাধুচরণের মুখে শোনা যায় দক্ষিণ পাড়ার মোড়লের নীলকরদের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

"..... ধানের ভুঁয়ে নীল করেনি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা বৎসর কি মারটিই মেরেছিল ; উহাদের খালাস কর্য্যে আন্তে কত কষ্ট, হাল গোরু বিক্রি হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।" (১/১)

আরেকটি দিকও নাটকে উঠে আসে তা হল দেশীয় জমিদার নীল কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতার - হিংস্রতা। বিদেশী নীলকরদের মত এরাও সমান ভাবে অত্যাচারী, দোষী। বরং এরা না থাকলে গ্রামের প্রজাদের সম্বন্ধে সাহেবদের কাছে কোন তথ্য যেতনা। সেদিক থেকে এরা খানিক বেশিই ছিল অত্যাচারী। নাট্যকার এখানে ভারী চমৎকার কৌশল নিয়েছেন। ইংরেজ নীলকরদের দোষ দেখানো হয়েচে গোপীর দৃষ্টিতে আর ভারতীয় নীলকরদের দোষ দেখানো হয়েছে উডের দৃষ্টিতে। এই দুই শ্রেণী ছাড়া আর একটি শ্রেণী হল দেশীয় মহাজনেরা। এরা টাকা ধার দিয়ে তেজারতি করে। এই শ্রেণীটি যে কতটা হিংস্র, উডের প্রশ্নের উত্তরে এক উমেদার যা জানা যায় তা থেকে স্পষ্ট -

"..... রাইয়তেরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।" (৫/১)

কাজেই সর্বার্থেই এ নাটক নীলচাষের দর্পণ।

১.৪. নীলদর্পণ : গঠন কৌশল

গঠন কৌশল বা গঠনতত্ত্ব প্রসঙ্গটি এসেছে মূলত ভাষাবিজ্ঞান থেকে। একটি বাক্যকে বিচার করার পদ্ধতির নাম হল 'Structuralism criticism' বা গঠন তত্ত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রূপতত্ত্ব হল কোন সাহিত্য - সামগ্রীর নানা ভাগে বিভক্ত রূপের ব্যাখ্যা বর্ণনা। অন্যদিকে গঠনতত্ত্ব হল, নানা ভাগে বিভক্ত রূপাঙ্গিকের মধ্যে সম্পর্ক খোঁজা এবং শেষে একটি তত্ত্বকে আবিষ্কার।

'নীলদর্পণ'এর গল্পটিকে বিশ্লেষন করলে গোলকচন্দ্র বসুর আত্মহত্যাকে মধ্যবিন্দু বলা যায়। রাইয়ত ও গৃহস্থরা ক্রমেই বিক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। নবীন মাধব উড সাহেবকে লাথি মারে, তোরাপ নাক কেটে নেয় এবং রোগকে চিৎকরে ফেলে ; সাবিত্রী মিসেস উডকে (আসলে সরলতা) হত্যা (?) করে। নাট্যকার নানা বিভিন্ন সংলাপের মধ্যে দিয়ে নীলকরদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে অত্যাচারের সমান্তরাল ধারায় প্রতিশোধ গ্রহণ ও চলেছে।

আরেকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় নবীনমাধব, গোলক ও সাবিত্রীকে নিয়ে ঘটনার অগ্রগমন। গোলক ও সাবিত্রীর সক্রিয়তার কারণে নবীন আপাত দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু নবীনই নায়ক। ধীরে ধীরে সে সক্রিয় হয়। নবীণকে শায়েস্তা করার জন্য গোলকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়। আসলে নবীন হচ্ছে গোলক ও সাবিত্রীর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মাঝখানের হাইফেন ; তাদের দু'জনের মিলিত দিক।

এই নাটকের গঠনের ক্ষেত্রে সাধুচরণও একটা বড় অংশ। সাধুচরণ, তা স্ত্রী রেবতী, তাদের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি, কনিষ্ঠ সহোদর রাইচরণ - গোটা পরিবারই নাটকে উপস্থিত। সাধুচরণেরপ্রসঙ্গটি খন্ডকাহিনী হিসেবে উঠে এসেছে। মূল কাহিনীর একটি বর্ধিত অংশ হিসেবে দেখা গেছে। কেননা নবীন মাধবের আদর্শেরবর্ধিত দিক হচ্ছে সাধুচরণ। ধান্যক্ষেত্ররূপা ক্ষেত্রমণির পরবর্তী স্তর রূপে আছেন অন্নপূর্নারূপিনী সাবিত্রী। আবার পদী ময়রাণী বিপরীত চিত্র রূপে ক্ষেত্রমণি উপস্থিত নাটকে। একজন অসতী, অপরজন স্ত্রী। একজন নীলক্ষেত্র, অন্যজন ধানক্ষেত্র।একজন সাধুচরণ নিজের সন্তানের মৃত্যুতে অবিচল, নবীনের মৃত্যু প্রসঙ্গে সেই-ই উচ্ছাসে উথলিত।

রেবতী ও নাট্য গঠনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। সে বলে -"ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড়বাবুরি খালে।" উড রোগের অত্যাচারকে এভাবে রেবতী একটি বিন্দুতে স্থাপন করেছে। এই নাটকের গঠনের আড়ালে এই কথা বা ভাবনাগুলি লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়।

১.৫ নীলদর্পণ : সংলাপ

নাটকের একটি অত্যাবশকীয় অঙ্গ হল সংলাপ। সংলাপই গোটা নাটকের বিষয়কে, ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। চরিত্রকে দর্শকের দরবারে পৌঁছে দেয় এই সংলাপ। কাজেই এই সংলাপকে হতে হবে - চরিত্রানুগ, ব্যঞ্জনাময় ও ইঙ্গিতধর্মী, যথাযথ, ক্ষিপ্র এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন।

'নীলদর্পণ' নাটকের সংলাপের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি বড় হয়ে ধরা পড়েছে, তা হল চরিত্রগুলি সাধুভাষায় কথা বলেছে। যা খুবই অস্বাভাবিক। কোথাও কোথাও অলঙ্কার বহুল সংলাপ ব্যবহৃত হওয়ায় গতিমন্দ হয়ে পড়েছে। কাজেই ভদ্র চরিত্রগুলির সংলাপ কৃত্রিম হয়েছে। তবে এর পেছনেও কারণ আছে। অত্যাচারিত প্রজা ও রাইয়তদের মানসিক আবেগ ও আদর্শের বিশুদ্ধতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার দুই রকম ভাষার ব্যবহার করেছেন - সাধু ও কথ্য। সাধুভাষা একটি বিশেষ প্রয়োজনে নাট্যকার এখানে প্রয়োগ করেছেন। নাটিকটি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নাটকের প্রথম দিকের তুলনায় শেষের দিকে সাধু গদ্যের প্রকারও পরিমাণ দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে।সাবিত্রী-সরলতা-সৌরন্ধ্রী- নাটকের শুরুতে সহজ সরল মৌখিক গদ্য ব্যবহার করেছে, কিন্তু নাটকের গুরুতব ও প্রয়োজীয়তা অনুযায়ী এ নাটকে ভাষার ব্যবহার ও প্রকার পরিবর্তিত হয়েছে।

'নীলদর্পণ' এর ভদ্রেতর চরিত্রের সংলাপ রচনায় দীনবন্ধু অনেক বেশি

সাবলীল। তবে এই ভদ্রতের চরিত্রগুলোর সংলাপে নদীয়া, যশোর, খুলনা - এই জেলার ভাষার প্রভাব আছে। নারী-পুরুষ-ভদ্র-ভদ্রেতর, স্বদেশী-বিদেশী - নীলদর্পণের 'সকল চরিত্রের সংলাপের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল - ছড়া-প্রবাদ-প্রবচন-শ্লোকের ব্যবহার। এর কারণ হল অধিকাংশ প্রবাদই হল জীবন থেকে রচিত, বাস্তবতা থেকে রচিত। এক বিশেষ নীতি আদর্শ এই প্রবাদ-প্রবচনে উঠে আসে। 'নীলদর্পণ' ও এক বিশেষ আদর্শ নিয়ে রচিত। কাজেই সেই আদর্শের কথা - নীতির কথা প্রচারিত এই সব প্রবাদ প্রবচনে।

নাটকে 'নীল' শব্দটির পর একাধিক শব্দ জুড়ে নানা পদ বা অভিধার সষ্টি করা হয়েছে। যাকে বলে Epithet'। সব চরিত্রই এটা করেছে। যেমন - নীল বাঁদর (দ্বিতীয় রাইয়ত), 'নীলবানর' (সাবিত্রী), নীলমভূক (নবীনমাধব), 'নীলযম (গোপী) ইত্যাদি। এই পরপদগুলি নিন্দাবাচক, অবাঞ্ছিত, ভীতিজনক। এছাড়া ভদ্রেতর সকল চরত্র 'সমিন্দি' (সম্বন্ধী) এই সম্বোধনটির প্রয়োগ করেছে নীলকরদের প্রতি।

১.৬ 'নীলদর্পণ' নাটক নয় নাট্যচিত্র মাত্র

অথবা, 'নীলদর্পণ' নাটকটি কয়েকটি চিত্রের সমষ্টিমাত্র

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক - এর সামাজিকও রাজনৈতিক মূল্য অপরিসীম। এটি একটি উদ্দেশ্য মূলক রচনা। কিন্তু শিল্পগত মূল্য বিচারের জগৎ স্বতন্ত্র। নীলদর্পণের পুরোপুরি নাট্যগঠনের আদর্শ রক্ষিত হয়নি বলে সমালোচকই সংশয় প্রকাশ করেছেন কেউ একে নাট্য চিত্র বলেছেন, কেউ বলেছেন নক্শা কেউ বা বলেছেন বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং আর ফলে গ্রামবাসী চাষী পরিবারের সর্বণাশ দেখানোই নীলদর্পণের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য ও বক্তব্য যাই হোক না কেন তাকে একটিকাহিনীর মধ্যে সংবদ্ধ করতে হবে। কাহিনীর মধ্যে নাট্যিক ঐক্য ও দ্বন্দ্বমূলক সংহতি থাকা প্রয়োজন।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকেকি নাটকোচিত ঘনপিনদ্ধ ঐক্যবদ্ধ কাহিনী নাই ? এই নাটক,এ গোলোক বসুর পারিবারিক সর্বনাশ প্রদর্শিত হয়েছে। কাহিনী হিসাবে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে সম্পন্ন জোতদার পরিবার স্বরপুরের বসুদের নীলচাষের ব্যাপার নিয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। সেই সংঘাতের ফলে গোলোক বসু কারারুদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র নবীনমাধব প্রাণ হারিয়েছে। সাবিত্রী পাগল হয়ে গিয়ে কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সরলতার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেছে। এই ভাবে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বসু পরিবার বিধস্ত হয়েছে। একে পূর্ণাঙ্গ নাট্য কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত বলা যায় না। কারণ এর বিভিন্ন অংশে মধ্যে কার্যকরণের সূত্রে অনিবার্যতা গড়ে ওপঠে নি। নাটকের প্লটে একটি দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক সমস্যাই প্রধান হবে। দ্বন্দ্ব এ নাটকে ও আছে। নীলকরেরা জোর করে জমিতে নীল চাষ করবার জন্য দাদন দেবে, গোলোক বসু নির্দিষ্ট কতকগুলি জমিতে নীলচাষ করতে রাজি হলেও সব জমিতে নীল ফলিয়ে ধনে প্রাণে সর্বস্বান্ত হতে রাজি নয়। বৃদ্ধ ব্যাক্তিত্বহীন গোলক বসু সাহেবদের অত্যাচারের ভয়ে রাজি হলেও জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীন মাধব এতে সম্মত নয়। এই দ্বন্দ্ব একটা সাধারণ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের বহুগ্রামে দেখা দিয়েছিল। নাট্যকার নবীনমাধবদের অত্যাচারিত কৃষিজীবি গণ সমাজের মুখপাত্র রূপে গ্রহন করে একটি ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে রূপ দিয়েছেন। ইতিহাস গত কোনো অর্থনেতিক সংগ্রামকে নাট্যরূপ দেওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন উক্ত ঐতিহাসিক সংঘাতকে ব্যাক্তিগত উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করা।

নীলদর্পণ নাটকে পূর্বোক্ত কাহিনীর কোন পাত্র পাত্রীরই ব্যাক্তিগত জীবন প্রকাশ পায় নাই। যদি নীলকরদের খলনায়ক রূপে গ্রহণ করি তবে তাদের ব্যাক্তিগত জীবন কথা প্রকাশ পাওয়ায় কোনো ক্ষতি হয় নাই। কারণ তাদের খলতা প্রদর্শনই নাটকের উদ্দেশ্য। ব্যাক্তিগত জীবনের কোনরূপ চিত্র প্রকাশের সুযোগ এ নাটকে নাই। কিন্তু কোন পাত্রপাত্রীরই অন্তর্লোক আলোড়িত হয় নাই। অন্তরের সঙ্গে অন্তরের টানাপপোড়নের মধ্যে কোন ঘটনাপর্যায়ের সৃষ্টি হয়নি। নীলকরেরা অত্যাচার করেছে আর তারা অত্যাচারিত হয়েছে। নাট্যকাহিনী ঘনীভূত হয়ে ওঠার পক্ষে এটাই হলো প্রধান বাধা। দ্বিতীয় বাধা হল এই কাহিনীর ভিত্তিতে যে সংঘাত আছে তা যতটা ভাবাশ্রয়ী ততটা ঘটনাশ্রয়ী নয়। নীলকরদেরঅত্যাচারের চিত্রই আছে, বাধার ব্যাপার গুরুত্ব পায়নি।

নীলদর্পণ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে নবীন মাধবদের কাহিনী। তার পাশাপাশি আরও একটি কাহিনীর আভাস আছে ক্ষেত্রমণির পরিবারকে কেন্দ্র করে। তা ছাড়া অন্য কতকগুলি চরিত্রকে কেন্দ্র করে এমন কতকগুলি দৃশ্য আছে যার সঙ্গে নবীন মাধবদের সর্বনাশের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন - ক্ষেত্রমনিদের কাহিনী। ক্ষেত্রমনিদের কাহিনী এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধির পক্ষে লেখকে সাহায্য করেছে স্বতন্ত্র ভাবে চরিত্র চিত্রণে ও সংলাপে সাফল্য দেখিয়েছে, কিন্তু মূল কাহিনীকে প্রয়োজনীয় সংহতি তো দিতে পারেনি উপরন্তু শিথিল করে তুলেছে।

আর একটি দিক দিয়েও কাহিনীর শৈথিল্য লক্ষ্যনীয়। নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী থাকতে পারে কিন্তু সে কাহিনী কোন মতেই বিচ্ছিন ভাবে অবস্থান করতে পারে না তাদের ও মূল কাহিনীর সঙ্গে নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য করে তুলতে হয়।

বসু পরিবারের সঙ্গে সাধুচরনের কাহিনী বলা হয়েছে বটে কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে। রাইচরণ ও সাধুচরণের ওপর নিগ্রহ এবং তাদের আরও শাস্তি দেবার জন্য সাধুচরণের সন্তান সম্ভবা কন্যা ক্ষেত্রমনির ওপর রোগ সাহেবের অত্যাচার এবং পরিণামে ক্ষেত্রমনির বেদনাময় মৃত্যু এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত। ক্ষেত্রমনির কাহিনী নাটকীয় পাশ্বকাহিনী হয়ে ওঠেনি। আবার ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র কাহিনী ও হয়নি। অর্থনৈতিক পীড়নের সঙ্গে নৈতিক অত্যাচার ও এখানে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক জুলুমবাজি এবং নারীর সতীত্ব নাশের বিবরণ গল্প হয়ে উঠতে পারে নি, হয়েছে কয়েকটি শিথিলবদ্ধ চিত্রের সংকলন।

নীলদর্পণকে নাট্যচিত্র বলা হলে নাটক হিসাবে এর মূল্যকে অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয়। সে কথা ঠিক হলেও এটাই নাটকের যথার্থ পরিচয়। উদ্দেশ্য প্রচার করতে গিয়ে নাটকীয় সংহতি পূর্ন প্লট তৈরী হয়নি।তার বদলে শিথিলবদ্ধ ঘটনা পরম্পরার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নীলকর সাহেবদের কুটিরের দৃশ্যকটি ও জীবন্ত। তোরাপ ও অন্যান্য রায়ত দের যে গুদামে বন্দী করে রাখা হয়েছিল একটি দৃশ্যে তার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। নবীন মাধবদের পারিবারিক কাহিনীর দিক থেকে এরূপ একটি দৃশ্যের হয়ত প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এরূপ একটি নাট্য তাৎপর্যে পরিপূর্ণ দৃশ্যের সৌন্দর্য হেলায় হারানো যায় না।

দীনবন্ধু মিত্র উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিদ্রোহ কে মুখ্যস্থান না দিয়ে ক্রমাগত অত্যাচারের বর্ণনার দ্বারা করুন রসে পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নীলকরদের, কাছে যেন কোন আবেদন সৃষ্টি করেছেন। এই কারণেই নাটকে প্রকৃত স্বরূপ এর কাছে তিনি অবিচার করেছেন। তাই নীলদর্পণ নাটক যে কতগুলি দৃশ্যের সমষ্টি এই অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করা যায়না।

১.৭ নীলদর্পণ : উদ্দেশ্যমূলক রচনা

নীলদর্পণ দীনবন্ধুর মিত্রের বিখ্যাতনাটক। তৎকালীন সমাজের বিশেষ করে গ্রাম বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এ নাটকের মূল বিষয়। নাট্যকার নাটকটির ভূমিকায় লিখেছেন - "নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার -শ্বেত চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখরক্ষা।" - আমারা বেশ বুঝতে পারি লেখক এই কথাগুলি নীলকর সাহেবদের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং নাটকটি যে উদ্দেশ্যমুলক রচনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন -

"কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

> সমাজ সংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্যে করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয় । কিন্তু নীলদর্পণের উদ্দেশ্য এবং বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট । তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থাকারের মোহময়ী সহানুভুতি সকলই মাধুর্যময় করিয়া তুলিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রেরউক্ত মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি নীলদর্পণ উদ্দেশ্যমূলক নাটক হলেও নাট্যকারের অসাধরণ সৃষ্টি কৌশলে এটি প্রচারধর্মী নাটক না হয়ে যথার্ধ রসোর্ত্তীর্ন নাটক হয়েছে।

নীলদর্পণে দুটি পরিবারের কাহিনী আছে যে দুটি পরিবার নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়। দীন বন্ধু মিত্রের উদ্দেশ্য ছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও পীড়নের রূপটি পরিস্ফূট করা । যে সব কৃষক চাষ-আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জমিতে দাগ দিয়ে জোর করে দাদন দিয়ে নীল চাষ করতে বাধ্য করা। নীলচাষে অবাধ চাষীদের গ্রেপ্তার করে এনে কুটিতে বন্দী করে রাখা -দৈহিক নির্যাতন করা - এমনকি পরিবারের স্ত্রীলোকদের ওপর অত্যাচার করা, প্রভৃতি নাট্যকার তার নাটকে দেখাতে চেয়েছেন । প্রসঙ্গক্রমে যাতে ইংরেজ রাজকার্য পরিচালকগন সদ্বিচার করতে উদ্যোগী হন এই ছিল নাট্যকারেরউদ্দেশ্য। তাই নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন -

> "এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছে, তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবার অনায়সে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমারা এক্ষনে দশমুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছে, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ। কেবল ধনলাভ পরতন্ত্র হইয়া প্রকাশ করলে অনিচ্ছুক।"

কিন্তু নাটক রচনার উদ্দেশ্য যাই থাক, দীনবন্ধুর শিল্পীমন যখন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কাহিনী নির্মাণ করেছেন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তখন উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে গেছেন । সাধুচরন ও গোলক বসুর পরিবার ও অন্যাণ্য রায়তদের পরিবার অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে । তারই প্রেক্ষাপটে - সাধুচরণ, রাইচরণ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী, তোরাপ, গোপীনাধ,উডসাহেব, রোগসাহেব চরিত্রগুলি আপন আপন ব্যাক্তিমহিমায় উজ্জল হয়ে উঠেছে । অবশ্য নাট্যকার ভদ্রচরিত্র গুলিকে জীবন্ত করতে পারেন নি । বসুপরিবারের পুরুষ চরিত্রগুলি আদর্শবাদী, স্ত্রীচরিত্র অত্যাধিক আবেগ প্রবণ ও মমতাময়ী হয়ে উঠেছে। এমনকি তাদের সংলাপের ভাষাও হয়ে উঠেছে কৃত্রিম কবিত্বপূর্ন । তবুও তাদের চিরন্তন মানব স্বভাব পরিস্ফুটনে বাধা পায়নি । নবীনমাধব, সাবিত্রী,সৌরি ব্ধী ও সরলতার চরিত্রতাদের

মনোভাবের অকুণ্ঠ প্রকাশ ও কার্যকলাপে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

সাধুচরণ ও গোলকবসু গ্রামের সম্ভ্রান্ত কৃষক তাদের ভাল ভাল জমি নীলকর সাহেবরা নীলচাষে লাগাতে চায়। তাদের নীতি - সামান্য দাদন দিয়ে নীল চাষ করানো, ফসলের চাষ বন্ধ, অর্থ না দেওয়া। একজন রাইয়ত নবীন মাধবকে বলে -

> "বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওইয়াবার কেউ নেই - গেল সন আট গাড়ি নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেলেনা, আবার বকেয়া বাকী বলে হাতে দড়ি দিয়েছে।"

অত্যাচারের এই দৃশ্যচিত্র নিঃসন্দেহে সামাজিক একটি সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু নাট্যকার সমস্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মানব জীবনের প্রতিহত আশা আকাঙ্খা ও বেদনাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। সুতরাং সমস্যাকে অতিক্রম করে তাঁর দৃষ্টি জীবনের দিকে প্রসারিত হয়েছে। তারই তাগিদে নাট্যকার ব্যাক্তি চরিত্রের রূপ ও রহস্যকে পরিস্ফূট করতে চেয়েছেন।

ক্ষেত্রমণির ওপর রোগ সাহেবের অত্যাচার তার জীবন সংশয় যে গভীর বেদনা তার পিতামাতার মনে সৃষ্টি করেছে। তার পরিচয় দিতে গিয়ে নাট্যকার মানবজীবনের এক চিরন্তন দুর্ভাগ্যের চিত্র এঁকেছেন। 'নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি' - রেবতীর মাতৃহৃদয়ের এই আকুল ক্রন্দন চিরন্তন বাণীমুর্তি লাভ করেছে। ক্ষেত্রমণির মৃত্যুকালে রেবতির উক্তি 'মুই সোনার নক্কি ভেসয়ে দিতে পারব নামা রে, মুই কনে যাব রে' - এ ক্রন্দন সর্বকালের জননীর আকুল আর্তনাদ। প্রজাপালক নবীনমাধবের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে সদ্য বিধবার অস্থিরতা, শোকে পাগলিনী সাবিত্রী কর্তৃক পুত্রবধু সরলতার প্রাণবধ ইত্যাদির মাধ্যমে বসু পরিবারের শোক বিধস্ত চেহারাই অঙ্কিত হয়েছে।

বলতে গেলে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নাটক সমস্যা মূলক রচনা। গ্রীক নাট্যকার এ্যারিস্টোফেনিস থেকে শেক্সপীয়র, আবার আধুনিক কালে ইবসেন, গলসওয়ার্দি এবং টি. এস. এলিয়ট সকলে সমস্যামূলক নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু সমস্যাকে তাঁরা এমন ভাবে নাট্য কলাকৌশলের সঙ্গেসমন্বিত করেছেন যে নিছক সমস্যারূপে কলোন নাটক আমাদের মনন শক্তিকে মাত্র সন্তুষ্ট করে না, সবোধকেও তৃপ্ত করে। দীনবন্ধু সমস্যাকে পরিস্ফুট করতে চাইলেও তাঁর শিল্পীমন প্রত্যেক চরিত্রের সঙ্গে আপনাকে সর্বব্যাপী মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। নাট্যকার প্রত্যেক চরিত্রের মর্মে প্রবেশ করে তার রূপ ও স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে যে সমস্যাকে তিনি পরিস্ফুট করবেন তার ও সমাজীবন সম্পর্কে তাঁর নিবিড় অভিজ্ঞতা আবশ্যক। এছাড়া নাট্যকারের সহানুভূতি ও কল্পনাশক্তি থাকতেহবে। এগুলি নাটক রচনার অপরিহার্য গুন।আবার নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য সেই হেতু কলাকৌশলের দিকটি

টিপ্পনী

পরিস্ফূট না হলে তা সার্থক হয় না

'নীলদর্পণ' উদ্দেশ্যমূলক নাটকহলেও উপরে উল্লিখিতগুন সমূহ এর মধ্যে আছে। সে উদ্দেশ্য শিল্পগত রূপ লাভ করায় তা রসপরিণাম লাভ করেছে। দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটকে নীলকরদেরঅত্যাচার হেতু বাঙালী সমাজের যে বেদনা তা মানবিক বেদনা বোধের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্য অপেক্ষা রস সৃষ্টিই এখানে প্রধান হয়েছে।

টিপ্পনী

১.৮ নীলদর্পণ : ট্রাজেডি প্রসঙ্গ

কোমল ও রোমান্স কল্পনায় পূর্ণ বাঙালীর বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকতার সাথে পরিচয় উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে। জীবনের লাভ লোকসান, সুখ-দুঃখ, প্রত্যাশা - হতাশা, সম্পর্কে বাঙালী সচেতন হল পাশ্চাত্যের সাহিত্যের ও দর্শনের বস্তুমুখীনতা ও জীবনমুখীনতার প্রভাবেই। এই পর্বেই বাঙালীর আত্মীয়তা গড়ে উঠল 'ট্রাজেডি' সাহিত্যের সঙ্গে। রঙ্গমঞ্চে এলেন শেক্সপীয়ার। কিন্তু পূর্ণতার আদর্শে বিশ্বাস ও জন্মান্তরীন কর্মফলের প্রত্যয় পূর্ণ সংস্কৃত নাটকে এই Art-form টি ছিল উপেক্ষিত, নিষিদ্ধ ও বলা যায়। কেননা আস্তিক্যবোধের সাথে ট্রাজেডি কল্পনার বিরোধ আছে।

ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে উনিশ শতকের বাঙালী পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিকের সাধে পরিচিত হয়েছে, অনুশীলন করেছে।দীনবন্ধু মিত্র পাশ্চাত্য আঙ্গিক ১৮৬০ সালে লিখেছেন 'নীলদর্পণ'। বাংলাদেশের নীলকরদের অত্যাচারের এক আলেখ্য বেদনা- বিধুর ভাবে এখানে হাজির হয়েছে। ঘটেছে বেশ কয়েকটি জীবন বিয়োগ। পরিণতিটি ও বিষদান্তক। তাই নাট্য সাহিত্যের আলোচনার ধারায় নীলদর্পণ ট্রাজেডি কিনা এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলতে আছে।

মধ্যযুগে ট্রাজেডির আদর্শ ছিল এমন - দুর্ভাগ্য হঠাৎ এসে মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে। গ্রীক ট্রাজেডির আদর্শ অ্যারিস্টটল তাঁর "ই পোয়েটিকস্" গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংজ্ঞা নির্দেশ করেন -

> "Tragedy is an imitation of an action that is serious, compleet and of an certain magnitude in language embellished with eah kind of artistic ornament, The several part of the play ; in the form of action, not of narrative ; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions."

প্রকৃত ট্রাজেডির (Tragedy) তত্ত্ব হচ্ছে : -

১। একজন সর্বগুণ সম্পন্ন দেবদুর্লভ নরোত্তমের বিষাদান্ত কাহিনীর, যার অক্ষম লড়াই নেমেসিস বা নিয়তির সাথে যিনি নিয়তির আঘাতে পর্যুদস্ত হবে কিন্তু হার মানবে না।

২। নায়কের ভয়াবহ পরিণতি দর্শক ও পাঠকের মনে করুণা ও ভয়ের (Pity and fear) সৃষ্টি করে।

৩। ট্রাজেডির পাত্রপাত্রীদের সংলাপ হবে সংগীত বহুল উচ্চাঙ্গ কাব্যগুন সমন্বিত (High poetry of melody)

৪। কাহিনী এগোবে সংলাপের মধ্য দিয়ে।

৫। পাঠক মনে ঘটবে ভাবমোক্ষণ (Catharsis)

নীলদর্পণে ট্রাজেডি সৃষ্টির উপকরণ আছে। সাধারণ ভাবে নীলকরদের অত্যাচার বর্ণিত হলেও তাদের উৎপীড়নে ও প্রতিহিংসা দীপ্ত ক্রোধে বিপর্যস্ত হয়েছে দুটি পরিবার। সাধুচরণের পরিবার ধর্ষিতা ক্ষেত্রমণির গর্ভপাত হেতু মৃত্যু এবং গোলক বসুর মিথ্যে হাজত বাসের লজ্জা থেকে আত্মহত্যা, নবীনমাধবের মর্মান্তিক জীবনাবসান,ক্ষিপ্তা জননীর সন্দেহ বশে পুত্রবধুর জীবন হানি ও প্রকৃতিস্থ হয়ে অনুশোচনায় তাঁর মৃত্যুই - এ সকল অপরিমিত শোচনীয় অপচয়ের কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়েছে।

দুটিপরিবারের এই যে শোকাবহ পরিণামতা নিয়ে উৎকৃষ্ট ট্রাজেডি নাটক রচনা করার অবকাশ ছিল।

কিন্তু নীলদর্পণ সার্থক ট্রাজেডি হতে পারেনি। কেন না বংশ পরম্পরাগত কোন পাপ বা কোন চারিত্রিক দুর্বলতা বা ত্রুটির জন্য এখানে ট্রাজেডি আসে নি। এখানে মানুষের থেকেই এসেছে মানুষের যাবতীয় অত্যাচার, লাঞ্ছনা। গ্রীক ট্রাজেডির আদর্শ বা শেক্সপীয়রের রীতি অনুসৃত নয়। শেক্সপীয়রের নাটকে ট্রাজেডির বীজ নায়ক চরিত্রে নিহিত। তাঁর চরিত্রের ত্রুটির রন্ধ্রপথে দুর্ভাগ্যের শনিপ্রবেশ করে। এই বিপর্যয় এত আকস্মিক ও গভীর যে তা দর্শক মনে নায়ক সম্বন্ধে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে।

এখানে অত্যাচারিত দুর্গত মানুষের প্রতিরোধের অসম সংঘর্ষের ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। উভয় পক্ষ শক্তি সামর্থে সমান হওয়ায় দ্বন্দ্ব তীব্র হয় নি। সংঘর্ষ যত তীব্র হয় আশা - নিরাশায় দোদুল্যমান পাঠক মনে ততই প্রতীক্ষরস ঘনীভূত হয়, নাট্যপরিনাম জানতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে অসম সংঘাত চিত্তকে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

উৎকণ্ঠিত, আবেগ মথিত না করে নিরুপায় নরনারীর করুণ পরিণাম মনকে ভীতি বিহ্বল রাখে। স্বভাবত এখানে করুনরস প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু তা ট্রাজিক রসকে ঘনীভূত করে নি। বাস্তব জীবনে যা ঘটে তা নিয়ে নাটক সৃষ্টি হয় না। যা সম্ভাব্য ঘটনার প্রবাসে যা অনিবার্য ; তা নিয়ে নাটক রসসিদ্ধ পরিনামী হয়। অ্যারিস্টটল একে বলেন - What is possible as being probable or necessary."

প্রজাপালক নবীন মাধব অসহায়তাবাদে অনুগত প্রজাদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতেন, সংঘাত তাতে তীব্রতর হত - মহিমান্বিত হতত তাতে ট্রাজিক পরিণাম কিন্তু উদ্দেশ্য মূলক নাটক রচনা করতে গিয়ে দীনবন্ধু অত্যাচারী নীলকরদের হাজির করেছেন। প্রাধান্য পেয়েছে করুণা।

দীনবন্ধু অত্যাচারের যে চিত্র হাজির করেছেন তা দর্শক পাঠকের মন ক্রোধো দীপ্ত করে , উৎপীড়িতের প্রতি সমতা সঞ্চারিত করে। কিন্তু ট্রাজেডির যে রস তা জীবনবোধকে নিবিড় করে তুলে আত্মদর্শনের মাধ্যমে মনে মমতা এনে দেয়। ক্রোধ ও সমতার দুটি বিপরীত প্রবাহ পরিণামে কারুন্য প্রবাহ উন্মুক্ত করে দেয়, কিন্তু সকল বিক্ষোভের উর্দ্ধে মনকে জীবনরসের নিত্যলোকে আহ্বান জানায় না।

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেভে নাট্যকার তত মনোযোগী নন। তাই নায়ক - চরিত্র হিসাবে কোন একজনকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় । নবীনমাধব নীলকরদের হৃদয়হীনতা সম্পর্কে আহিত হয়েও আবেদন নিবেদন করেছে- পিতৃশ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত নীলবপন বন্ধ রাখার জন্য তিনি ৫টাকা সেলামী দিতে চেয়েছেন। কিন্তু পেয়েছেন অপমান - অবমাননা। সাহেবের জুতোর আঘাতের প্রত্যুত্তরে বুকে লাথি মারলে প্রতিশোধ উন্মত্ত সাহেবের লাঠির আঘাতে নবীন মাধবের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুপ্রায় নবীন মাধবকে বাড়িতে এনে সাহেবের কুঠিতে সাংঘাতিক ঘটনা মৌখিক বর্ণনাতেই শেষ হয়েছে। যদিও প্রচুর নাটকীয় উপাদান ছিল নাটকীয় ভাবে প্রকাশ করার।

নাটকের শেষ দৃশ্যে কিছু মৃত্যুর ঘটনা। কেউ তা দেখে একে নিকল (Nicol) নির্দেশিত Horror Tragedy বলেছেন। একটি মৃত্যুর প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি জাগাতে না জাগাতেই আর একটি মৃত্যু ঘটেছে। ফলে ভাবমোক্ষনের পূর্ন সুযোগ ঘটেনি। পরপর পাঁচটি মৃত্যুর সমারোহ ট্রাজেডির সূক্ষ্মবেদনাকে স্থূল করে তুলেছে। কিন্তু মৃত্যুই ট্রাজেডির বড় কথা নয় , ব্রাডলের মতে - "the central felling is the impression of waste" জীবনের সকল সম্ভাবনায় শোকাবহ অপচয়ের কারুণ্য ট্রাজেডির সুর ও জীবনের মহিমা দৃশ্য যেভাবে এসেছেতাতে অবিশ্বাস্য কিছুই নেই; কিন্তু এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল স্মরণীয় - "A Convincing impossibility is preferable to an uncominiucing possibility." -

এই মৃত্যুর দৃশ্য সম্ভাব্য হলেও, যেহেতু তা মনকে অসাড় করে তোলে, তাই রস সৃষ্টির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে মন যেমন অসাড় হয়ে ওঠে, এখানে ও তেমনই অনুভূত হয়েছে। শোককারী দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে মন নিদারুণ আঘাতে অভিভূত হয়। কিন্তু ট্রাজিক মহিমা অনুপস্থিত থাকে।ও যেখানে পাপকে ধ্বংস করার জন্য সৎগুণ সমূহ আত্মযন্ত্রণার মাধ্যমে সচেতনভাবে বিলুপ্ত হয়, ট্রাজেডির মহিমা সেখানেই প্রতিষ্ঠিত।

তাই সার্থক বিচারে নীলদর্পণকে ট্রাজেডি না বলে বিষাদান্তক নাটক বলা যায়।

টিপ্পনী

১.৯ নীলদর্পণ : মৃতুমিছিল

বাংলা নাট্য সাহিত্যের উন্মেষ পর্বের এমনকি সমগ্র বাংলা নাট্য সাহিত্যের একজন অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র।সমকালীন সাহিত্য কয়েকগন বিশিষ্ট ব্যক্তি যুগের কয়েকটি ঘটনা দীনবন্ধুকে খুব নাড়া দিয়েছিল।যার প্রতিফলন দেখা যায় তার সবশ্রেষ্ঠ নাটক নীলদর্পণ এর মধ্যে আমাদের বতমান আলোচ্য বিষয় নীলদর্পণ নাটকের একাধিক মৃত্যু কি নাটকটিকে শুধু মাত্রই মৃত্যুর মিছীলে পর্যবসত করেছে আসলে এই সম্পকে বিভিন্ন সমালোচক বিরুপ মন্তব্য করেছেন।এই অতিরেক ও অতিশখ্য নাটকটির নাট্যগুন খন্ডিত করেছে। মৃত্যগুলি অপরিহার্য ছিল না।ফলে এখানে অতিনাটকীয়তা দেখা গেছে।স্বাভাবিকতা ও হারিয়েছে।

এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটু সর্তক হয়ে বিশ্লেষন করলেই দেখা যাবে, মৃত্যুগুলি এক -এক ভাবে ঘটেছে।একাধিক মৃত্যু থাকলেই তা দোষবহ কিছু হয় না শেক্সপিয়ারের নাটকে ও একাধিক মৃত্যু দেখা যায়।

আমরা এবার নাটকের কাহিনী বিন্যাসের ধারাটি লক্ষ করতে পারি। ক্ষেত্রমনির মৃত্যু দৃশ্যে রেবতী বিষয়টির দৃষ্টি আর্কষন করেছে। রেবতীর উক্তিতে আছে, রোগ সাহেব ক্ষেত্রমনির মৃত্যুর কারন, উডসাহেব নবীনের মৃত্যুর কারন। দুই নীলকর সাহেব দুটি চরিত্রের মৃত্যুর কারন হয়ে নাটকের কাহীনিতে একটি সংহতি এনেছে, বসু ও ঘোষ পরিবার একটি বিন্দু তে সম্মেলেত হয়েছে।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী

অপর মৃত্যুগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য গোলকের মৃত্যু, এই মৃত্যুর মধ্যে একদিকে আছে মূল্যবোধ অন্যদিকে নিয়তির অভিভব। বিনা অপরাধে কারাবাস এবং সেখানকার অন্নজল গ্রহন এক বিশেষ পাপ বলে মনে করবার জন্য গোলোক আত্মহত্যা করেছেন। নীলকর এখানে প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকারী নয়। প্রশাসন যেখানে গোলককে মুক্তি দিয়েছে, গোলক সেখানে আত্মহত্যা করে নিয়তি নিগৃহীত হয়েছেন।হয়তো আর একটু আগে সে হুকুম এলে তিনি আত্মহত্যা

টিপ্পনী

করতেন না। গোলোক নবীন সাবীত্রী পর্যায়ক্রমে একটি সুস্পষ্ট শৃঙ্খলায় নিয়তি নিগৃহীত হচ্ছেন। নিয়তি নিগ্রহের সেই ধারা পথটি (পিতা -পুত্র-মাতা) অনুসরন করলেই নাট্যকারের সচেতন পরিকল্পনাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে বঞ্চিত মূল্যবোধ সমগ্র নাটকটিকে পরিচালিত করেছে, সেই মূল্যবোধই এবার এখানে ভয়ঙ্কর এক মানসিক শক্তি রূপে দেখা দিয়ে নিয়তির রুপ ধারন করেছে।

গোলোকের মৃত্যুই নাটকের 'প্রথমত মৃত্যু',পরিবারের প্রধান পুরুষ রূপে নীলের প্রথম শিকার সঙ্গত কারনেই তাকে করা হয়েছে। পিতার মৃত্যুতে শোকাহত নবীন পিতারই সম্মান রক্ষায় প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে আবতীর্ন হন ।সুতরাং পিতার মৃত্যুর অপরিহার্য ফলরূপে পূত্রের মৃত্যু হয় - দুটি মৃত্যুকে কার্য- করনের সূত্রে অনায়াসেই বাধা যায়।

পিতা পূত্রের অতপর সঙ্গত কারণেই একটি শৃঙ্খলাময় পারম্পর্য অনুসরণ করে মাতার ক্ষেত্রে এসে ধারাটি পৌঁচেছে। স্বামী - পুত্র সাবিত্রীর উন্মাদিনী হওয়া যে খুবও স্বাভাবিক কবিরাজ তা বলেছেন। পরপর দুটি পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নীলনিয়তির যে বাহ্য ও অন্ধশক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে এসে তা মানসিক ও আন্তর এক নিগূঢ় সত্তার পরিণত হল। মৃত্যুর ধারাটির একটি বিবর্তন ঘটল। তবে এখানেও মূল ভাবধারা সেই মূল্যবোধেই ক্রিয়াশীল। নীল এই বার পুরুষ নীলকরদের বাহ্য দিক পরিত্যাগ করে একজন নারী নীলকরের রূপ ধরেছে : সতী নারী সাবিত্রী অসতী নারী মিসেস উডকে তাঁর অন্তরে একটি প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ। নীলকর যেমন নবীন - ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর কারণ, তেমনি সাবিত্রী সেই নীলকরদের নারীসত্তা - মিসেস উডরূপী সরলতাকে হত্যা করে এক করুন প্রতশোধ নিয়েছেন।

একদিকে হত্যার বদলে হত্যা করে প্রতিশোধের আত্মতৃপ্তি অপর দিকে সেই প্রতিশোধ যখন স্বজন হননে পর্যবসিত, তখনই তা নিয়তির এক বীভৎস প্রকাশ হয়ে যায়। অতঃপর আপন মৃত্যু দিয়ে সাবিত্রী পুত্রবধূ হত্যার ঋণ শোধ করেন। প্রতিশোধ এবার ঋনশোধে পরিণত হয়। এইভাবে নাট্যকারের পরিকল্পনাটিকে বুঝে নিতে পারলে মৃত্যুগুলিকে যেমন আকস্মিক, বিচ্ছিন্ন ও পরিহার্য বলে মনে হবে না, অন্যদিকে তার পরিমাণও অধিক বলা যাবে না।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
16

১.১০ নীলদর্পণ : নায়ক বিচার

'নীলদর্পণ' নাটকের নায়ক কে, এই নিয়ে সমালোচক মহলে মতভেদ আছে। কেউ এই সম্মান দিতে চান বসুকে কেউ বা নবীন মাধবকে, আবার কেউবা যৌথভাবে চাষি সমাজকে। যে কোন নাটকের নায়ক বিচারে আমরা অ্যারিস্টটলের নাট্যতত্ত্বের দারস্থ হই। যেহেতু 'নীলদর্পণ' একটি ট্রাজিক নাটক তাই আরো বিশেষ

করে অ্যারিস্টটলের মতবাদের উপর নির্ভর করতে হয়। তাঁর মতে ট্রাজিক নায়ক ধার্মিকহবেন না,কারণ ধার্মিক লোকের জীবন ট্রাজিক ধর্মী হবে না। ট্রাজিক নায়ক ভালোমন্দ মিলিত। নায়ক হবে সেই যার পতনের জন্য দায়ী থাকবে নিজস্ব কিছু ভুল ও ত্রুটি। এখন অবশ্য অ্যারিস্টটলের নায়ক বিচার পদ্ধতিটির পূর্নমূল্যায়ন করা হচ্ছে। তাই আজ অখ্যাত চরিত্র সাধারণ মানুষ ট্রাজেডির নায়ক হিসাবে বিবেচিত হতেপারে।

এই নাটকে নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত গ্রামবাংলার অবস্থা দেখবার জন্য নাট্যকার বেছে নেন স্বরপুর এর বসু পরিবারকে। সে পরিবারের কর্তা গোলোক বসু ও তার গিন্নি সাবিত্রী দেবী। আর তার পরিবারে আছেন তাদের দুই পুত্র নবীন মাধব ও বিন্দু মাধব এবং দুই পুত্রবধু সৌরিন্ধ্রী ও সরলতা। গোলেক বসু নিরীহ সজ্জন ব্যাক্তি। তাই তিনি সকলের ভালো করে নিজে ভালো থাকতে চান। নীলকরদের এড়িয়ে থাকতে চাইলেও শেষপর্যন্ত তিনিই জড়িয়ে পড়েন নীলকরদের সাজানো মিথ্যা মামলায়। আসলে তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র নবীনমাধব গ্রাম জুড়ে নীলকরদের প্রতিবাদ করায় সাহেবরা নিরীহ গোলোক বসুকে মিথ্যা মামলায় হেনস্থা করে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। এভবেই তারা প্রতিবাদী নবীন মাধবকে সায়েস্তা করতে চেয়েছিল। নবীন মাধব বলেছিল গত বছরের ৫০ বিঘা জমির নীল চাষের মূল্য চুকিয়ে না দিলে সে এবছর একবিঘা জমিতেও নীল চাষ করতে দেবে না।

এমতাবস্থায় নবীনমাধব অত্যাচারের মোকাবিলা করার সুযোগ নেয়, শুধু তাই নয় আর এই প্রতিবাদী সত্তাটি গ্রামের অন্যান্য রায়তদের প্রতিবাদী হবার সাহস যোগায়। গ্রামের অভ্যন্তরের এসব সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে নীলকুঠিতে পৌছে গেলে নবীন মাধব সাহেবদের কাছে শত্রু হয়েওঠে। নবীন মাধব মামলা চালানোর বুদ্ধিতে যে কূটবুদ্ধি সম্পন্ন তাও দেওয়ানের মাধ্যমেই সাহেবরা জেনেছে। প্রজা হিতৈষী নবীনমাধব প্রতিবেশীদের বিপদে সর্বাগ্রে ঝাঁপীয়ে পড়তো। আর এভবেই সে নাটকে নায়কোচিত ভূমিকা পালন করেছে। যেমন ক্ষেত্রমনিকে বেগুন বেড়ের কুঠিতে রোগ সাহেব তুলে নিয়ে গেলে সে তোরাপকে সঙ্গী করে নারীর ইজ্জত বাঁচাবার জন্য কুঠিতে পৌছে গেছে। পিতার নিষেধ সত্ত্বেও এভাবেই সে বার বার অপরের কারণে সাহেবদের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়েছে। ফলে তাকে সহ্য করতে হয়েছে সাহেবদের অশ্লীল। গালাগালি ও শারিরীক নির্যাতন। শিক্ষানুরাগী নবীন মাধব কেবল নিজের ছোটভাই বিন্দু মাধবকে শিক্ষিত করতে চেয়েছে। গ্রামের এমন আশা ভরসার স্থল নবীন মাধব। আর তাকেই নুইয়ে ফেলে সাহেবরা সমগ্র গ্রামবাসীর মনোবলকে ভেঙে দিতে চেয়েছে। তাই তারা সদ্য পিতৃহারা নবীন মাধবের আর্জিকে অগ্রাহ্য করে শ্রাদ্ধের আগেই তাদের পুকুর পাড়ের জমিতে নীল চাষ করতে উদ্যোগ নেয়। এই আর্জি জানাতে গিয়ে নবীন মাধব সাহেবদের পদাঘাতে আহত হয়েছে, কিন্তু ক্ষুব্ধ নবীন মাধব উল্টে সাহেবকে পদাঘাত করায় শেষ পর্যন্ত তরোয়ালের

টিপ্পনী

আঘাতে অসময়ে মৃত্যু মুখে পাতিত হয়েছে। তার এই করুন পরিণতি বলাই বাহুল্য গ্রাম জুড়ে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

নাটকে এভবেই নবীনমাধবের সাহস, পরোপকারিতা প্রভৃতি সৎ গুণাবলীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে । তবে লক্ষনীয় তার এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষের চেয়ে পরোক্ষরূপেই বেশি প্রকাশিত অর্থাৎ অন্যের মুখের (সাধুচরণ, গোলক বসু, সাবিত্রী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) সংলাপে চরিত্রটির বীরত্ব যতটা প্রকাশিত ততটা প্রত্যক্ষভাবে তার কার্যাবলী নাটকে উপস্থাপিত নয় । তার এই প্রত্যক্ষতার অভাবেই চরিত্রটির নায়কত্বের গুরুত্ব লাভের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাঁরা নবীন মাধবকে 'নীলদর্পণ' এর নায়ক বলেন তাঁরা নবীন মাধবের নায়কত্বের প্রাণস্বরূপ তার বংশ কৌলিন্য, সামাজিক উচ্চাবস্থান, বীরত্ব, পরোপকারিতা, উদাতা, সৎ সাহস, প্রতিবাদী মানসিকতা প্রভৃতির উল্লেখ করেন। এমন একটি চরিত্রের অমন মৃত্যুতে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে জাগে ভয় ও করুণা । ব্যাক্তিগত জীবনেও নবীন মাধব ছিল শ্রদ্ধেয়, সে ছিল পিতৃভক্ত, মাতৃপরায়ন, পত্নীপ্রিয়, ভ্রাতৃবধুর প্রতি স্নেহপরায়ন এক আদর্শ গৃহস্থ পুরুষ। তার উপর শুধু তার পরিবারের সদস্যরাই ভরসা করেনি, গ্রামের লোকজনও বিপদে আপদে তাকেই সহায় বলে জেনেছে। তাই দেখি জনৈক রায়তকে নীলকুঠিতে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হলে সে নবীন মাধবকেই তার ছেলে মেয়েদের দেখবার ভার দিয়ে নিশ্চিত হয়নেছে। কিন্তু এই নবীন মাধব পিতার বাধ্য সন্তান হয়েও পিতার কথা না শুনেই অত্যাচারী নীলকরদের প্রতিহত করতে গ্রামের সকলের হয়ে এগিয়ে গিয়েছে। ইংরেজদের কারণে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিনেও সে শত প্রয়োজনে পত্নী বা ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কারে হাত দিতে চায়নি। নীলকরদের অত্যাচারে যখন তার সহ্যের সীমা ভেঙে গিয়েছে তখনই সে হঠকারীভাবে অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছে । হয়তো দীনবন্ধু এমন চরিত্র সৃজন করে জনমানসে প্রতিবাদ ভাবনাকে অঙ্কুরিত করতে চেয়েছিলেন।

নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক, নাট্যকারের উদ্দেশ্যই ছিল সাধারণ মানুষকে দুর্গতির ছবিটি দেখিয়ে প্রতিবাদী করে তোলা। এই বিশেষ উদ্দেশ্য মূলকতা নিয়েই নাটকের নায়কচরিত্র নবীন মাধব নির্মিত ; যা যৌথভাবে নীলচাষী সমাজকে প্রতিরোধের ভাবনায় অন্তত কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল।

সুতরাং 'নীলদর্পণ' নাটকে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র স্পষ্ট নয়। এখানে কোন একজন প্লটে গুরুত্ব পেয়ে নায়কের উচ্চতা বা যোগ্যতা অর্জন করেনি। বরং এখানে চরিত্র-গুলির দুটি শ্রেনী আমরা লক্ষ্য করি - অত্যাচারি ও অত্যাচারিত। যে চরিত্রটি গুরুত্বে অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে অর্থাৎ নবীনমাধব তার জীবন সংগ্রামের

টিপ্পনী

দিকে আমাদের নজর পড়ে, কিন্তু তার মৃত্যু ও এই মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে তার সমগ্র পরিবারের চরমতম বিপর্যয় - চরিত্রটিকে সেই অর্থে নায়ক হয়ে উঠতে দেয়নি। সে নীলচাষের প্রতিরোধে যত কথা বলেছে তত কাজ করতেপারেনি। ক্ষেত্রমণির ধর্ষন হয়ত রোধ করতে পেরেছে নবীন মাধব কিন্তু তার মৃত্যু আটকাতে পারেনি। এভাবেই নাটক একজনের অর্ন্তবেদনাজাত করুন রস প্রাধান্য পায়নি, বরং যৌথ কৃষক সমাজকে আশ্রয় করেই নাটকের বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। তাই বলা যেতেই পারে এই নাটকে সমষ্টিজীবন আলোচিত। অত্যাচারী শ্রেনী এখানে একমুখী হয়ে অত্যাচার করেছে এবং লক্ষনীয় তারাও একটি গোষ্ঠী। অন্যদিকে অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের বিরোধী বৈশিষ্ট্য নাটকে উপস্থিত। সাহেবরা নির্যাতনে অমানবিক। নাট্যকার দেখিয়েছেন নীলচাষ প্রতিরোধ করতে গিয়ে কিভাবে ঘরে ঘরে মানুষ স্বজনকে হারিয়েছিলেন। স্বজন হারানোর এই জ্বালাই পরবর্তী কালে বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ 'নীলদর্পণে'র নায়কত্বের দাবী নবীন মাধবকে ছাড়িয়ে ব্যাপকতর সমাজকেই ব্যঞ্জনা করে।

টিপ্পনী

১.১১ 'নীলদর্পণ' নাটকে হাস্যরস

এক সময় দীনবন্ধু মিত্রের মূল পরিচয়ই ছিল হাস রসিক রূপে। সেই হাস্যরসকে তিনি যত্রতত্র কারনে অকারনে তাঁর নাটকে রূপ দিয়েছিলেন এমন অভিযোগও করা হয়েছে। বলা হয়েছে তাঁর হাস্যরস স্থূল ও স্থানে অশালীন এবং অনেক ক্ষেত্রেই নাটকের পক্ষে তা অপরিহার্যও নয়। কিন্তু নীলদর্পণ সম্পর্কে এই অভিযোগ কতখানি সত্য সেটাই বিচার্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে 'কৌতুক হাস্য' এবং 'কৌতুক হাস্যের যাত্রা' প্রবন্ধদুটিতে হাস্যরসের দুটি দিকের কথা বলেছেন- প্রথমটি এর পরিমাণগত বিভেদের দিক, দ্বিতীয়টি হল অসংগতির মাত্রা ভেদ। অসংগতির মাত্রা বৃদ্ধির ফলে কমেডি হয়ে যায় ট্র্যাজেডি। 'নীলদর্পণের হাস্যরস কেও এই দুটি দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করা যেতে পারে। অর্থাৎ কোথায় কিভাবে এতে অসঙ্গতি এসেছে এবং তাতে মাত্রা বৃদ্ধির বিপর্যয় ঘটেছে কিনা। এছাড়াও আর একটি দিক আছে, দীনবন্ধুর সমকালে বঙ্গীয় হাস্যরসের ধারা।

'নীলদর্পণ' যেহেতু করুনরসাত্ম, বিষাদ-পরিনামী নাটক, সেহেতু হাস্যরস সৃষ্টির অবকাশ স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে সীমিত। তবুও নাট্যকার এখানে কিছু হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, নাটকের প্রধান চরিত্র বা কাহিনীর প্রধান ধারাতে হাস্যরস নেই। শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের মত হাস্যরসের বিস্তার এখানে সীমাবদ্ধ। নাটকের প্রথমদিকে অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে হাস্যরসনের সন্ধান মিললেও পরবর্তীতে পরিবেশ যত গম্ভীর হয়েছে হাস্যরস তত বিলীন হয়ে গেছে। সুতরাং বলা যায় নাটকের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি

রেখই হাস্যরসের বিস্তার ঘটেছে।

বিদেশী চরিত্র রূপে উড-রোগের সংলাপে যে মর্মান্তিক হাস্যরস আছে, তাকে আদৌ হাস্যরস বলা যায় না, তবে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বাদী পক্ষের মোক্তারকে লিখতে বলে -

'বল, বল আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।' তখন তার Redy wit এর প্রশংসা করতেই হয়। এছাড়া নিজেদের মধ্যে রসিকতা করবার জন্য তোরপ সহ রাইয়তেরা নীলকরদের 'নীলমামদো'. 'নীলবাঁদর' প্রভৃতি যে আখ্যা দিয়েছে, তার উদ্দেশ্যেও মূলত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা। এর মধ্যে তৃতীয় রাইয়তের রসিকতা বেশ মনোরম। ভুতের ভয় পেয়ে অন্যান্য দেব-দেবীর নাম উচ্চারণের শেষে অসুরের নামও উচ্চারণ করেছে, ভয় পেয়ে সে বলেছে -

"মুই তবে মলাম, মামদো ভুতি পালি নাকি

ঝক্কোতে ছাড়ে না ? বউ যে বললো।"

'নীলদর্পণ' নাটকে পরিস্থিতিগত হাস্যরসের চেয়ে বাচনিক হাস্যরসের চেয়ে বাচনিক হাস্যরসই বেশি। তবে পরিস্থিতিগত হাস্যরসের একটি নিদর্শন মেলে। দ্বিতীয় রাইয়তের উক্তিতে ইন্দ্রবাদের কোর্টে দুই মোক্তারের বাক্‌যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে বলেছে -

> "ওয়া : ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেটর সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, দুই সুমুন্দি মোক্তার ওমনি র, র,কর‍্যে অ্যাসেছে, হেড়াহেড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নামাধে সাদখাঁদের ধলাদামড়া আর জমাদ্দারদের বুড়ো এঁড়ে নড়ুই বেদলো। " (দুই /এক)

উপমান রূপে মানবেতর প্রানীকেও এ নাটকের হাস্যরসের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই নাটকের ভদ্র চরিত্রের তুলনায় ভদ্রেতর চরিত্রেই হাস্যরসের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে বলে মনে হয়। এর প্রধান কারন হল ভদ্রেতর চরিত্রের মুখের ভাষা। এব্যাপারে আদুরী পদী ময়রানী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি চরিত্রের আচরণ ও সংলাপ লক্ষ্যনীয়। বসুপরিবারের ঝি আদুরী কথায় কথায় রসিকতা করে।সৌরিন্ধ্রী আদুরীকে ডানদিকে চালের বাতা থেকে তামাকের কৌটা আনতে বললে আদুরি ডানকে ডাইনি অর্থে গ্রহণ করে বলেছে -

> "মোগার কপালের দোষ, গরীব লোকের মেয়ে যদি বুড়ো হল আর দাঁত পড়ল তবেই সে ডান হয়ে ওটলো।"

টিপ্পনী

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
20

শ্লেষ বক্রোক্তির এমন কৌতুক নাটকের গম্ভীর পরিবেশেকে একটু স্বাভাবিক করেছে, পাঠকও একঘেয়েমীর হাত থেকে বেঁচেছে। এই আদুরী আবার সাহেবের কাছে কেন যেতে পারবে না তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেচছে -

"মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোন্ধ সইতি পারিনে - থু, থু গোন্দো ! প্যাঁজির গোন্দো।"

তোরোপের আচরণেও এসেছে হাস্যকর পরিবেশ। রোগ সাহেবের হাতে বিশাল নাদনা দেখে ভয় পেয়ে মিথ্যা সাক্ষি দিতে রাজী হবার সময় মনে মনে বলেছে -

"বাবারে ! যে নাদনা, অ্যাকন তো রাজি হই, ত্যকন ঝা জানি তা করবো।"

আবার ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের দৃশ্যে রোগ সাহেবকে উত্তম -মধ্যম দিয়ে ফিরে আসার সময় সে ঠাট্টা করে যখন বলেছে, ছোট সাহেব স্যালাম,মুই আসি' তখন এই মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যেও পাঠক কৌতুক অনুভব করে।

নীলদর্পণ নাটকের হাস্যরসের একটি ক্রমবিকাশ আছে। নাটকের প্রথম দিকের হাস্যকৌতুক চতুর্থ অঙ্কে এসে তির্যকতা ও ব্যঙ্গ -বিদ্রুপে রূপান্তরিত হয়েছে। পন্ডিতদের মধ্যে এবং অনন্তর হাস্যসের আর পরিচয় বা নিদর্শন নাটকে নেই। তবে এই নাটকে নাট্যকারের রুচি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নাটকের হাস্যরসের উৎকর্ষতার মুলে যেমন এর ভাষা রয়েছে, তেমনি এই ভাষা প্রয়োগে শ্লীলতার সীমাকে অতিক্রম করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন ভাষাগত স্বাভাবিকতার জন্যই এর হাস্যরস এত প্রাণবন্ত হয়েছে।

আসলে দীনবন্ধু চেয়েছেন পরিপূর্ণ জীবনের চিত্র আঁকতে। বিষয়গত কারণে নীলদর্পণ' ট্র্যাজিক নাটক। দুঃখের সীমাহীনতার চিত্র আঁকলে দর্শকের মনে তা দাগ কাটতে পারবে না ভেবে মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারনা করেছেন নাট্যকার। ফলে বেদনাত্মক জীবনচিত্র ও সরস, সুন্দর, জীবন্ত ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। নাটকের ট্র্যাজিক রসের কোন হানিও ঘটেনি তাতে।

১.১২ 'নীলদর্পণ' নাটকের ভদ্রেতর চরিত্র

দীনবন্ধুমিত্রের নীলদর্পণ যে রসের নাটক এখানকার চরিত্রগুলি বিচার কালে সেই রসের দিকটিকেই আগে বিচার করে দেখতে হবে। যে চরিত্র যে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত, তাদের মধ্যে সেই সেই উপাদান নাট্যকার কতখানি বাস্তব সম্মতভাবে খন্ডিত করতে পেরেছেন, তার বিচারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বিচারে নাট্যকার জনসাধারণ ও দুষ্ট চরিত্রাঙ্কনে অসাধারণ বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিলেও তথাকথিত সৎ ও সাধু প্রকৃতির ভদ্র চরিত্র অঙ্কনে ততটা সার্থক হননি। এদের ব্যবহার, ভাষা ইত্যাদি অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে পড়েছে বলা যায়। এই নাটকে নাট্যকার রায়ত শ্রেনী, মধ্যবিত্ত শ্রেনী ও ইংরেজ চরিত্র - এই তিন শ্রেনীর চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে রায়ত বা ভদ্রেতর চরিত্র অঙ্কনেই তিনি সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন। তৎকালীন বাংলার সমাজ জীবনে এরা তাদের স্বাভাবিক আচরণ ও মৌখিক ভাষা নিয়ে বিচরণ করেছিল। তাদের মধ্যে থেকে নাট্যকার যেন তোরাপ, আদুরী, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, পদি ময়রাণী ও অন্যান্য রায়তদের তুলে এনে নাটকে স্থান দিয়েছেন।

তোরাপ চিত্রটিকে নাট্যকার প্রায় একটি 'টাইপ' চরিত্র হিসাবে গড়ে তুলেছেন। সে বীরত্ব, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক। সে একজন সাধারণ মুসলমান কৃষক হলেও নবীনের মত কিছু মূল্যবোধ তার ছিল। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সাধুচরণকে সে বলেছে, সুযোগ পেলেও সে উডকে হত্যা করবে না - খোদার জীব পরানে মাত্তাম না।" আবার যখন তাকে জোর করে গোলক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষি দিতেবলেছে তখন সে বলেচে 'ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমুখ্যারামি কত্তি পারব না।" এই দৃঢ় চিত্ত তোরাপ তাই ক্ষেত্রমনির উদ্ধার দৃশ্যে রোগসাহেবকে বাগে পেয়ে তার আক্রোশকে মিটিয়েছে। কিন্তু পঞ্চম অঙ্কে এই তোরাপই যখন বলে -

"মুইএখন গোলার মধ্যে নুকায়্যে থাকি, নাত কর‍্যে পেলয়্যে যাব, সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেটয়ে দেবে।"

তখন তার মধ্যে ভদ্রেতর চরিত্রের ভীরু সরল প্রকৃতিটি প্রকাশ পায় সুতরাং তোরাপের চরিত্রের উজ্জল মুহূর্ত হল উড রোগকে শারিরীক শাস্তি বিধানে নয়, নবীন মাধবকে উডের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করতে না পারার জন্য আক্ষেপ।

"আল্লা ! বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে মুই বড় বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপাল ঘা মারিয়া রোদন)

তখন একজন সামান্য কৃষকের ভেতর থেকে মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন সদাশয় ব্যাক্তির অসহায় ট্র্যাজেডি ফুটে ওঠে।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
22

আদুরী চরিত্র সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন নিছক হাস্যরস সৃষ্টি জন্যই নাট্যকার এই চরিত্রটির সৃষ্টি করেছেন। নাটকে আদুরি ও সৈরিন্ধ্রীর কথোপকথোনের মাধ্যমে নাট্যকার হাস্যরস পরিবেশন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে দিবে চরিত্রটি নানা প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে বসু পরিবারের নানা তথ্য, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইন, সাহেব - বিবির নষ্টামী

প্রভৃতি। এর মধ্যেই আদুরীর গভীর স্বামীপ্রেমের সঙ্গে অতৃপ্ত জীবন তৃষ্ণাও ফুটে ওঠে। আদুরীকে নাট্যকার এক প্রাচিন পরিবারের ঝি রুপেই এঁকেছেন, যে ঐ পরিবারেই একজন হয়ে গেছে। তাই বসু পরিবারের বিপর্যয়ে তার সকল পরিহাস বিলীন হয়ে গেছে।

রেবতী সাধুচরণের স্ত্রী। অশিক্ষিতা গ্রাম্য রমণী রেবতী চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য তার মাতৃত্ব। শুধু কন্যা ক্ষেত্রমণির প্রতি নয়, দেবর রাইচরণের প্রতিও তার আচরণ এই মাতৃত্বের। তাই রাইচরণকে কুঠিতে ধরে নিয়ে যাবার সময় সে বলেছে -

"ওমা ওযে ডাব্‌কা ছেলে, ওযে এতক্ষন দুবার খায় না,
খেয়ে সাহেবের কুঠী যাবেকেমন করে , সে যে অনেক দূর।"

বাস্তববোধ সম্পনা, কর্তব্যপরায়না রেবতী মনের মধ্যে যে ধর্মকে সযত্নে লালন করে এসেছে, সে হল নারীর সতীত্ব ধর্ম। কোন কিছুর বিনিময়ে সেই ধর্মকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। তাই সে মেয়েকেসাহেবের কাছে পাঠাতে পারেনি। কিন্তু কন্যার মৃত্যু মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়েছে সেও তার পক্ষে ভালো ছিল।

"সাহেবের সঙ্গি থাকাযে মোর ছিল ভাল মারে, মুখ দেখে
জুড়োতাম মা রো"

এখানে মাতৃত্বের কাছে রেবতীর সকল ধর্ম বিশ্বাস, সতীত্ব বোধ ভেসে গেছে।

ক্ষেত্রমণি এই নাটকের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য নারী চরিত্র। সে কৃষকের ঘরে জন্মে অপূর্ব সোন্দর্যের অধিকারী হয়েছে। আর এই সৌন্দর্যই তার জীবনে কাল হয়েছে - 'আপনা মাংসে হরিনা বৈরী'। কৃষক বধু সন্তান সম্ভবা ক্ষেত্রমণিকে তাই রোগ সাহেবের কাম পিপাসার শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু অর্থ নয়, সম্পদ নয়, নারীর প্রকৃত সম্পদ তার সতীত্বকে রক্ষা করতে ক্ষেত্রমণি আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং ব্যর্থ হয়ে তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এই একটি মাত্র চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার তৎকালীন সুন্দরী যুবতীদের বাস্তব দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। রোগ সাহেবের গৃহে ক্ষেত্রমণির মুখের ভাষাও ভদ্রেতর চরিত্রের সার্থক স্ফূরণ।

আর নাটকের মধ্যে পদীময়রানীর ভুমিকা খুব বিস্তৃত নয়। তার চরিত্র সম্পর্কে নাটকে পাই। রোগ সাহেবের কু-প্রস্তাব ক্ষেত্রমণির কাছে পদী-ই করেছে, কিন্তু এই পদীর মধ্যেও দেখিবিবেক দংশন - 'উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই'। ক্ষেত্রমণিকে নীলকুঠীর কুঠীয়ালদের হাতে সমর্পন করতেও সে আন্তরিক ভাবে চায়নি। তাই ক্ষেত্রমনির ধর্ষণ দৃশ্যে রোগ সাহেবকে সে বলেছে -

"ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ি যাক, তখন আর একদিন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আসবে।”

কিন্তু এই ছোট সাহেবের কাছে সে অসহায়।

‘নীলদপর্ণ’ নাটকটি রচনার সময় দীনবন্ধু ভদ্র চরিত্রগুলির সংলাপ সাধু না চলিত ভাষা হবে এই নিয়ে সংশয়ে ছিলেন। কিন্তু ভদ্রেতর চরিতর নির্মানে তাঁর সে সংশয় ছিল না। এজন্য তাঁর ভদ্রেতর চরিতরগুলি সকলেই প্রায় অশিক্ষিত এবং তারা সকলেই তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। শুধু তাই ই নয়, কথা বলার সময় ছড়া, প্রবাদ, শ্লোকের ব্যবহার করেছ, সর্বোপরি তারা প্রায় সকলে ভীরু ও সরল। যদিও মাঝে মাঝে তারা গর্জে উঠেছে, কিন্তু তার পরেই তাদের অসহায়তা প্রকট হয়ে উঠেছে। সবমিলিয়ে সেই সময়ের গ্রামের অশিক্ষিত মানুষ গুলো যেমনটি ছিল তেমনটিই হুবহু উঠে এসেছে ‘নীলদর্পণ’ নাটকে।

প্রশ্নাবলী

১। নীলদর্পণ নাটকের গঠন কৌশলবিচার করো।

২। নীলদর্পণ নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৩। নীলদর্পন নাটক অথবা নাট্যচিত্র বিচার করো।

৪। ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে নীলদর্পণ নাটক কতটা বিবেচ্য আলোচনা করো।

৫। নীলদর্পণ নাটকটি অনেকাংশে মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়েছে আলোচনা করো।

৬। নীলদর্পন নাটকের নায়ক বিচার করো।

৭। নীলদর্পন নাটকের সংলাপ বিচার করো।

৮। নীলদর্পণনাটকের ভদ্রেতর চরিত্র বিচার করো।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (অষ্টম খন্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (প্রথম খন্ড), ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য।

৩। নাট্যতত্ত্ব বিসার, ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৪। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, শ্রী ভবানী গোপাল সান্যাল সম্পাদিত।

৫। নীলদর্পন, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত।

৬। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন। পুণর্মূল্যায়ন, ড. অশোক কুমার মিশ্র।

দ্বিতীয় একক

ডাকঘর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.১ নাট্যকার রীন্দ্রনাথ

২.২ ‘ডাকঘর’ নাটকের মূল ভাব

২.৩ ‘ডাকঘর’ : শ্রেণী বিচার

২.৪ ‘ডাকঘর’ : চরিত্র পর্যালোচনা

২.৫ ‘ডাকঘর’ : নামকরণ

২.৬ ‘ডাকঘর’ : সংলাপ

টিপ্পনী

২.১ নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ

বাংলা নাটককে বিশ্বনাটকে উন্নীত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মানবমুক্তি চেতনাই রবীন্দ্রনাট্যের কেন্দ্রীয় কথা। শোষন - শাসন, ন্যায়-বৈষম্য, লোভ ও হিংসার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী মন সর্বদা সোচ্চার হয়েছে। তাঁর নাটকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উঠে এসেছে। স্বতন্ত্র ধারায় নানা রূপরীতি ও আঙ্গিকের নাটক লিখেছেন তিনি।

গীতিনাট্য রচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক লেখার সুত্রপাত। মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিলাত ভ্রমণ করলে ওখানে বসেই তিনি তাঁর প্রথম নাটক, গীতিনাট্য - ‘ভগ্নহৃদয়’ (১৮৭৮) রচনা শুরু করেন। এরপর লেখেন ‘বাল্মিকী প্রতিভা’ (১৮৮১)। তাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঐবছরই নাটকটি অভিনীত হয়।বাল্মিকীর ভুমিকাব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন। এর কিছুইন পর রচিত হয় ‘কালমৃগয়া’। এরপর ‘রাজা ও রানী’ (১৮৮৯) এবং ‘বিসর্জন’ (১৮৯১) নামে দু’টি রোমান্টিক ট্র্যাজেডি নাটক লেখেন। প্রথম গদ্য - নাটক লেখেন ‘শারোদোৎসব’ (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)। এর পরপরই ‘মুকুট’ উপন্যাস থেকে ঐ নামেই নাটক লেখেন। পরবর্তী নাটক ‘প্রায়শ্চিত’ (১৩১৫)। এবার রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক ঋতুকে নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করলেন। ‘রাজা’ (১৯১০), ‘ফাল্গুনী’ (১৩২১/১৯১৬), ‘অচলায়তন’ (১৯১১)। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে তিনি দু’টি নাটক লেখেন ‘ডাকঘর’ ও ‘অচলায়তন’। এর পর ক্রমশ ‘মালিনী’ (১৯১২), মুক্তধারা (১৯২২), ‘গৃহপ্রবেশ’ (১৩৩২), “শোধবোধ’ (১৯২৬), ‘নটীর পূজা’ (১৩৩৩), ‘রক্তকরবী’ (১৩৩৩), ‘শেষরক্ষা’ (১৩৩৫), ‘পরিত্রান’ (১৩৩৬), ‘তপতী’ (১৩৩৬), ‘কালের যাত্রা’ (১৩৩৯), ‘তাসের দেশ’ (১৩৪০), ‘বাঁশড়ী (১৩৪০) প্রভৃতি নাটক রচিত

হতে থাকল।

রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু অতি চমৎকার প্রহসন রচনা করেন সেগুলো হল 'গোড়ায়গলদ' (১২৯৯), 'বৈকুণ্ঠে খাতা' (১৩০৩), 'চিরকুমার সভা' (১৩৩২), 'শেষরক্ষা' (১৯২৮),' মুক্তির উপায়' (১৩৫৫/১৯৪৮)। এগুলি বাদে কিছু কৌতুক নাটক ও তিনি রচনা করেন। সেগুলি 'হাস্যকৌতুক' এবং 'ব্যঙ্গকৌতুক' - এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

টিপ্পনী

তবে রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের নাটক লিখেছেন (গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য, ঋতুনাট্য,রুপকনাট্য, সাংকেতিক নাট্য, তত্ত্বনাট্য ইত্যাদি) তার মধ্যে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ রুপক এবং সাংকেতিক নাটকগুলি।

২.২ ডাকঘর : মুলভাব

রচনাকাল ও স্থান :

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসের শেষে ইংরেজি ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে বসে 'ডাকঘর' রচিত, নাটকটি লিখতে তিনদিন সময় লাগে।

ডাকঘর রচনার কারণ:

রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন ধরেই বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। মনটা তার দূরে কোথায়, দূরে দূরে' উড়ে যেতে চাইছে। কবি তাঁর এই সময়কার মানসিক অবস্থার ছটা বর্ণনা করেছেন আশ্রমিকদের কাছে 'ডাকঘর' নাটকটি ব্যাখ্যা করার সময়। এখনেই আমরা 'ডাকঘর' রচনার প্রেরণার কথা জানতে পারবো। সে সময় আশ্রমিক কালীমোহন ঘোষ তার অনুলিখন করেন। সেটি উদ্ধার করেন শান্তিদেব ঘোষ। সেই বর্ণনা তুলে দেওয়া যাক -

> "'ডাকঘর' যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু - উৎসবের জন্য লিখিনি। শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে সেখানকার মানুষের সুখ - দুঃখের উচ্ছাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। পূর্বে আমার দু'একটি

বেদনা এসেছিল আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল । যেন এখান হতে যাচ্ছি ।বেঁচে গেলুম। এমন করে যকন ডাকছেন তখন আমার দায়নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম । মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল । মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ- দিতে পারলে শান্তি আসে । ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক। আলংকারি[ক]দের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা । এটা বস্তুত কি? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছিলেন, তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্খা । সেই দূরে যাওয়ার মধ্যে রমনীয়তা আছে। যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছ, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল - বহুদূরে সে অজানা রয়েছে,তার পরিচয়ের ভিতরদিয়ে সে অজানার ডাক, দূর সেখানে মুগ্ধ করেছে, যাত্রা সেখানে রমনীয় বহু বিস্তৃতি অপরিচিতের মধ্যে যে আনন্দ। সেই যখন অন্তরালে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দিল সে ভাবটি প্রকাশ করলুম। থাকব না থাকব না, যাব যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে । সবাই ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে আর আমি কিনা বসে রইলুম। এই দুঃখকে ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে । এই ভাব যদি কারুর সম্পূর্ন অপরিচিত হয় তবে হেঁয়ালী বলতে পারো। এই বেদনা যদি কারো মধ্যে থাকে তবে সে বুঝতে পারবে এর মর্মটা কী।"

[রবীন্দ্রসংগীত]

এ প্রসঙ্গে আর একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি রবীন্দ্রনাথ ২২শে আশ্বিন ১৩১৮ (সোমবার ৯অক্টোবর ১৯১১) তে নির্ঝরিনী সরকারকে লিখেছেন -

" মা, আমি দূরদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নেই - কেবল কিছুদিন থেকে আমার মন এই কথা বলছে যে, পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এরপরে আর ত সময় হবে না। সমস্ত পৃথিবীর নদী-গিরি -সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে - আমার চারদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন উৎসুকল হয়ে পড়েছে। আমরা সেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি সেখানে আমাদের কর্ম ও সংস্কারের আবর্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরী করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজেদের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি,জগতের মধ্যে থাকিনে, অন্তত মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড়ো যাত্রার পূর্বে এই ছোটো যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্ছি - এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হব, তারই আয়োজন।"

[শ্রীমতি নির্ঝরিনী সরকারকে লিখিত, পত্র ১৯ চিঠিপত্র ৭]

রবীন্দ্রনাথ ১৭ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯এ লেখা একটি চিঠিতে পরিহাসচ্ছলে লেখেন -

" ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না - কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।"

দীনবন্ধু সি. এফ. এন্ডরুজকেও কবি একটি পত্রে (৪জুন ১৯২১) অমল সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন -

"I remember, at the time when I wrote it [The Post Office] my own feeling which inspired me to write it. Amal represents the man whose soul has received the call of the open road - he seeks freedom from the enclosure of habits sanctioned by the pendent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable."

[Letter to a Friend]

এই সমস্ত পত্রদির লেখাগুলো থেকে নিশ্চয়ই এতক্ষন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে 'ডাকঘর' নাটকের মূল ভাববস্তুটি কি ? এককথায় বললে দাঁড়ায় সুদূরের জন্য

ব্যাকুলতা। আর একটি বিষয় বোঝবার দরকার তা হল 'ডাকঘর', 'রাজা','চিঠি' - এই শব্দগুলোর কি কোন অন্তর্নিহিত অর্থ আছে ? আমাদের অন্তরে বাইরে অনেক বন্ধন, কিন্তু মনতো কল্পনাচারি সে পাখা মেলে সর্বত্র উড়তে চায় । সব আনন্দ আস্বাদন করতে চায়। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হলে তখন মনে হয় -

"অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ

ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশে

এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি।"

মন এই আধ্যাত্মিক বোধে উত্তীর্ণ হলে তখন বহু ইচ্ছে নয়, একটি ইচ্ছের মধ্যেই বহুত্বকে আস্বাদন করতে ইচ্ছে করে । তার আর বাইরের বহুত্বের কিবা প্রয়োজন, এবার বাইরের বার্তাগুলি আসুক একটি চিঠি হয়ে। এচিঠি সেই চিঠি যাতে বিশ্বেশ্বর বড় আদর করে তাঁর এই বার্তা পাঠালেন যে, তিনি মানবকে, শিশুকেও নিজের ভাবেন। তাকে তাঁর প্রিয় ভাবেন। সেই আহ্বাণ বার্তা মানব হৃদয়ে ধ্বনিত হবে চিঠির রূপকে।

টিপ্পনী

২.৩ ডাকঘর : শ্রেণীবিচার

'ডাকঘর' রূপক সাংকেতিক নাটক। সমালোচকগণ তাই-ই বলেন। রূপক নাটক কি? যে নাটকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোন ভাবকে বা তত্ত্বকে প্রকাশ করা, এবং তা করতে গিয়ে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদিকে আনা হয় - তাকে বলে রূপক নাটক । রূপকে রূপ ভাব বা তত্বের প্রয়োজনে ব্যবহৃত । আপাত একটি কাহিনী রূপের মধ্যে গভীর কোন ভাব বা তত্ত্ব উঠে আসে। আপাত কাহিনীর সমান্তরালে মূলভাবটি উঠে আসে।

'রূপক' এক ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Alligory' , যার অর্থ ' to mean other' অর্থাৎ এক বোঝাতে অন্য কথা বলা । রূপকের দুটি অর্থ - একটি হল আপাত গল্পের দিক, অন্যটি উপাখ্যান বা গল্প অতিরিক্ত ব্যঞ্জনার দিক । রূপকের বাইরের গল্পটি উপলক্ষ্য বা রাস্তা মাত্র। যে রাস্তা দিয়ে মূলভাবে পৌঁছোতে হবে এই গল্পের বাইরে একটি প্রচ্ছন্ন গল্প থাকে ; সেটিই আসল গল্প । এই রূপকের আশ্রয়ে কোন নীতিকথা, কোন বিশেষতত্ত্ব বা ভাবকে রসময় রূপ দান করা হয়।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী

সংকেত ; যার ইংরেজি 'symbol'। তবে 'Symbol' এর যথার্থ প্রতিশব্দ প্রতীক হলেই ভালো। তবে প্রচলিত আছে 'Symbolic Drama' র অর্থ 'সাংকেতিক নাটক' হিসেবে। প্রতীক নাটক বলাই যুক্তিযুক্ত । অনেকে যুক্তিদেন যে, সাংকেতিক সর্বত্র নির্দিষ্ট অর্থেই শেষ হয়, প্রতীকে সংকেতিক নির্দিষ্ট অর্থের

টিপ্পনী

পরেও অতিরিক্ত অর্থব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। সে দিক থেকে প্রতীক নাটক বলাই ঠিক মনেহয়।

তাই প্রতীক আর রূপক এক নয় সেটা স্পষ্ট। আর একটু স্পষ্ট ভাবে দেখতে গেলে বলা যায় রূপকের আবেদন বুদ্ধির কাছে। জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ। বুদ্ধির বিচারে অর্থের প্রভেদ ঘটতে পারে ফলে রূপকের অর্থ একাধিক হতে পারে। প্রতীকের আবেদন অনুভুতির কাছে ; কল্পনার কাছে। রূপক-রচনায় কোন রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। সুনির্দিষ্ট একটি জ্ঞান পরিবেশনই তার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সে কাজটি শেষ হলেই তার কাজ ফুরোয় অন্যদিকে আবহাওয়া সৃষ্টির ওপর নির্ভর করে প্রতীক নাটকের সাফল্য - অসাফল্য। ঐ পরিবেশ আমাদের কল্পনানুভুতিক উদ্দীপিত করে। সে কারণেই প্রতিক নাটকে অন্ধকার ঘর, পর্বতচূড়া, নদী তীর প্রভৃতি স্থান নির্বাচন করে আবহাওয়া বা পরিবেশ তৈরী করা হয়।

রূপক প্রতীক নিয়ে এত কথা বলা হল 'ডাকঘর' কে সামনে রেখে এই নাটকটি কোন শ্রেনীর নাটক সেই প্রসঙ্গকে সামনে রেখে। 'ডাকঘর' কোন শ্রেনীর নাটক, তা আলোচনার আগে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখেন ২৫শে ফাল্গুন ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। 'ডাকঘর' পরকাশিত হওয়ার পর 'প্রবাসী' পত্রিকায় মাঘ ১৩১৮ সংখ্যায় 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মুদ্রারাক্ষস' ছদ্মনামে 'ডাকঘর' এর আলোচনায় এক জায়গায় লেখেন - "ইহাকে একটি রূপক বলিয়া একটা ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি। অমল মানবাত্মা ....." ইত্যাদি। এই ব্যাখ্যার সূত্রে প্রিয়ম্বদা দেবী রবীন্দ্রনাথের মতামত চাইলে রবীন্দ্রনাথ লেখেন -

> " 'ডাকঘর' এর কোনো রূপক নেই - যা ওর শাদা মানে, তাই ওর মানে। প্রবাসীর সমালোচনা, ও একটা ব্যায়াম মাত্র। ওরকম অর্থ বের করে কি কোনো সুখ আছে ? সাহিত্যে 'অর্থমনর্থং ভাবয় নিতভং' - যদি ওতে কোনো সৌন্দর্য্য থাকে, কোনো রস থাকে, তাহলে আর কোনো কৈফিয়তের দরকার নেই - ছবি দেখতে গিয়েকেউ যদি ফ্রেমের সমালোচনা করতে বসে তাহলে তাতে চিত্রকরের কোনো গৌরব নেই। আসলে রূপক ও গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করার সুখটা এই যে তাতে কবির চেয়ে সমালোচকের গৌরব বাড়ে - কাব্যটাকে উপলক্ষ্য করে সমালোচকেরই বাহাদুরি প্রকাশ পায়।"
>
> [দ্রস্টব্য : পত্রাবলী - ৯, ৮মার্চ ১৯১২, রবীন্দ্রবীক্ষা - ২৭, পৃ-১২]

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট জানালেন 'ডাকঘর' -এ কোন রূপক নেই। দ্বিতীয়ত

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাকে গুরুত্বহীন মনে করে বললেন 'ব্যায়াম মাত্র'।

১৯৩৯ সালের ১৯মার্চ (১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৫ই চৈত্র) আনন্দবাজার পত্রিকার 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে'ডাকঘর' এর পরিচয় সম্পর্কে লেখা হয় -

> " 'ডাকঘর' শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় - কর্তৃক প্রকাশিত। ৪র্থ সংস্করণ > মূল্য আট আনা ল 'ডাকঘর' কবির প্রসিদ্ধ রূপক নাট্য যৌবনে এই বই পড়িয়া আমরা জীবন ও জগৎ নূতণ দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছিলাম। আশা করি আধুনিক কালের তরূণদের হৃদয়েও ইহা সাড়া জাগাইবে।"
>
> [দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩,পৃ - ২০৭]

রবীন্দ্রনাথের মতামত জেনেও সমালোচকগন একে সাংকেতিক বা রূপক সংকেতিক নাটক হিসেবেই গণ্য করেছেন।ক্ষুদিরাম দাস 'ডাকঘর' কে সাংকেতিক নাটক হিসেবে দেখেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন রূপক - সাংকেতিক নাটক। কাজেই পাঠক - সমালোচকের কাছে 'ডাকঘর' সাংকেতিক নাটক হিসেবে গণ্য। আমরা যাকে বলি প্রতিক নাটক।

নাটকে অমল চরিত্রের দুটো দিক - একটি হল বহির্জগতের দিকে ধাবিত তার মন, অন্যটি রাজার বা বিশ্বেশ্বরের বা অরূপের জন্য অপেক্ষা। আসলে এই দ্বিবিধ মানসিকতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ধারাবাহিক ভাবে একটা মানসিকতা পরিণত হতে হতে অপরটিতে গিয়ে মিশেছে। কাজেই প্রথমে অমল বাইরে - দূরে যেতে চায়, তারপর ক্রমে এক অধ্যাত্মবোধের উন্নীত হয় যা তাকে অসীমের অপেক্ষায় স্থির করে। এ প্রসঙ্গে অমলের একটি সংলাপ উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয় -

> "অমল।। না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরোছে না। আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে - এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে - একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি। -"

এই সংলাপে তো নানা প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে- 'রাজার ডাকঘর', 'চিঠি' যার হাত ধরে অমল গূঢ়তর ব্যঞ্জনাকে উস্কে দেয়। কিম্বা যখন সে পিসেমশাই মাধব দত্তকে বলে -

> "এখন আমি এই খানেই শুয়ে থাকব, কিছু করব না, -

টিপ্পনী

কিন্তু যেদিন আমি ভালো হব সেই দিনই আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব - নদী, পাহাড়, সমুদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।"

এই কথাগুলো কিসের প্রতীক ? কিম্বা ডাকহরকরাদের নামগুলো যখন হয় বাদল কিম্বা শরৎ, সেগুলো কি নিছক নামই হয়ে থাকে নাকি অসীম কালক্রমকে দ্যোতিত করে ?

টিপ্পনী

২.৪ ডাকঘর : চরিত্রপর্যালোচনা

অমল :

'ডাকঘর' নাটকের প্রধান চরিত্র অমল । অমলের পরিচয় দিতে গিয়ে নাট্যকার মাধব দত্তের মুখ দিয়ে বলান -

"আমার স্ত্রী গ্রাম সম্পর্কে ভাইপো । ছোটবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তার বাপও মারা গেছে।"

বাপ-মা হীন এই অনাথ বালককে মাধব দত্ত তার বাড়িতে তাদের কাছে রাখে । কারণ -

"মাধব দত্ত ।। আমার স্ত্রী যে পোষ্যপুত্র নেবার জন্য খেপে উঠেছিল।"

তাছাড়াও -

"মাধবদত্ত ।। ..... এই ছেলেটিকে আমার যে কিরকম লেগে গিয়েছে -"

এই অমল এখন তার নয়নের মণি, অন্তরের ধন। তার সম্পর্কে একদা কৃপণ মাধব দত্ত তাই বলে -

"আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মতো ছিল - না করে কোনো মতে থাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করছি সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।"

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে অমলের কঠিন অসুখ হয়েছে । বাঁচার আশা ক্ষীণ। কিছুদিন বেশি বাঁচিয়ে রাখতে গেলেও তাকে ঘরের মধ্যে প্রায় সব বন্ধ করে দিয়ে রাখতে হবে। কবিরাজের এই বিধান মতো পিসেমশায় মাধবদত্ত তাকে একদম ঘরের বাইরে যেতে দেয় না। অমলের সারাদিন কাটে রাস্তার ধারের ঘরের জানালায়

বসে। অমল পিসেমশায় মাধব দত্তের কাছে তার বাইরে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে পিসেমশায় জানান কবিরাজ বলেছে বাইরে গেলে অসুখ করবে। অমল এ উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারে না। জিজ্ঞেস করে যে কবিরাজ তা জানল কি করে। তখন পিসেমশায় বলেন কবিরাজ পুঁথি পড়ে সব জেনেছে। অমলও বড় হলে সব জানবে, পন্ডিত হবে, এই আশার কথা মাধব দত্ত জানান। উত্তরে অমল বলে -

"না, না, পিসেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পন্ডিত হব না - পিসেমশায়, আমি পন্ডিত হব না।"

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই পুঁথি পড়া বিদ্যোকে নিন্দা করেছেন। তাঁর অসংখ্য লেখাতে খুব দৃঢ় ভাবে সে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও তাই 'অমল ছেলেমানুষ', সে শুধু দেখতে চায় - ঘুরে বেড়াতে চায়। পিসেমশায় বলে, এত কি আছে দেখার যার জন্য অমল এত ব্যাকুল। কিন্তু বাইরের জগৎ বারে বারে কি টানে যেন অমলকে টানে। তার ইচ্ছে হয় দূরের পাহাড় ডিঙিয়ে দূর দেশে কোথাও চলে যেতে। অমলের এসব কথা পিসেমশায়ের কাছে পাগলামী বলে মনে হয়। কিন্তু অমল বলে চলে যে পৃথিবীটা কথা বলতে জানে, তাই যেন নীল আকাশে সে হাত তুলে ডাকছে। সেই ডাক বহুদূরের মানুষ শুনতে পায়। অমলের বিশ্বাস পন্ডিতরা ঐ ডাক শুনতে পায় না। এখানেই অমল চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় সুদূরের প্রতি ব্যাকুলতা - যে ব্যাকুলতা আসলে রবীন্দ্রনাথের নিজের। সে কথা রবীন্দ্রনাথ চিঠি - পত্রে বলেছেন।

এই যে সুদুরের প্রতি টান, ব্যাকুলতা তারই সূত্রে সে কখনো দই ওয়ালার মত দই বিক্রীর কাজ করতে চায়, কখনো ডাকহরকরা হতে চায়, আবার ভিক্ষেও করতে চায়। তাই দই বিক্রি করার জন্য সুর করে ডাক শিখতেও তার কোন অসুবিধে নেই। আসলে এসব কিছু হতে চাওয়ার মধ্যে তার একটি মাত্র উদ্দেশ্য - তাহ'ল এদের সবার মত অমলও দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াতে পারবে। ছেলেমানুষ অমল সুদূরের টানে হয়ে ওঠে প্রখর কল্পনাচারী। তার প্রকৃতি জগৎ নিয়েকল্পনা এত প্রকট যে সে কোন দিন দইওয়ালার গ্রামে না গিয়েও সেই গ্রামের প্রায় নিখুঁত বর্ণনা দেয়। অমল ও দইওয়ালার কিছুটা কথোপকথোন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা গেল -

"অমল।। না, কোনোদিন যাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি। অনেক পুরোনো কালের খুব বড়োবড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম - একটি লালা রঙের রাস্তার ধারে। না ?

দইওয়ালা।। ঠিক বলেছ বাবা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অমল।। সেখানেপাহড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওয়ালা ।। কী আশ্চর্য ! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বৈকি, খুব চরে।

অমল।। মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসি করে নিয়ে যায় - তাদের লাল শাড়ি পরা।

দইওয়ালা ।। বা ! বা ! ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লা পাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয় - কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে।"

'ডাকঘর' নাটকের কাহিনী অমলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। বাকী চরিত্ররাও অমলকে কেন্দ্র করেই আনাগোনা করেছে। সেদিক থেকে নিশ্চিত ভাবে অমলই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অনেকের মতে অমল চরিত্রটির মধ্যে ছেলেবেলার রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায়। গৃহভূ শ্যামের গন্ডি দেওয়া জায়গার মধ্যে বসে দরজা বন্ধ দেখে দিন কাটাতেন। অমলও তো বদ্ধ ঘরে খোলা জানালায় বসে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।

নাটকের একেবারে শেষে অমল ঘুমিয়ে পড়ে। এই আসলে মৃত্যুকেই ইঙ্গিত করে। সমালোচক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক' গ্রন্থে অমলের এই ঘুম প্রসঙ্গে বলেন -

"তাহার এই ঘুমের তাৎপর্য রহিয়াছে। ঘুম এখানে মৃত্যুর প্রতীক বলিয়াই বোধ হয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই পরমাত্মার সহিত মানবত্মার যোগ সাধিত হয়।"

আরো তিনি বলেন -

"কিন্তু এই মৃত্যু জীবনের শেষ নয়,উহা শেষ নয়, উহা নবজীবন লাভের মাধ্যম মাত্র, মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনই আবার নবরূপে ফিরিয়া আসে। মৃত্যু পূর্ণতায় পৌঁছিবার সোপান, মৃত্যুর মধ্যেই মানুষের বন্ধন মুক্তি। সুতরাং কেহ যদি এই ঘুমকে এক রকমের প্রতীক নিদ্রা বলিতে চাহেণ তাহাতে আপত্তির কোনো কারণ থকিতে পারেনা, কারণ মৃত্যু এক রকমের নিদ্রা, সেই নিদ্রাভঙ্গে মানবাত্মা অরূপের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে।"

এই অমল সম্পর্কে নীহারঞ্জন রায় বলেছেন -

"বালক অমল সুদূরের আহ্বান, অজানার ইঙ্গিতানুভূতির প্রতীক হিসাবেই সত্য ; তাআ না হইলে রুগ্ন বালক - চিত্তের প্রকাশ হিসাবে অমলকে খানিকটা 'মরবিড' বা দুঃখ -বিলাসি এবং অতিরিক্ত প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ বলিয়াই মনে হয়। তাহার ভাষন একটু অতিরিক্ত চিন্তাভারগ্রস্থ এবং বালক বা কিশোর হিসাবে একটু বেশি কবি সুলভ।

টিপ্পনী

মাধব দত্ত :

অমলের আশ্রয়দাতা ; দুঃসম্পর্কের পিসেমশাই হল মাধব দত্ত। নাটকে মাধব দত্ত অমলের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠতে দেখা যায়। সে ছিল নিঃসন্তান। তার স্ত্রী তাকে একটি সন্তানকে পোষ্যপুতর হিসেবে নেওয়ার জন্য খুব অনুরোধ - উপরোধ করে। সেই কারণে অমলকে তারা পোষ্যপুত্র হিসেবে নেয়। আসলে অমলকে মাধবদত্তের কীরকম লেগে গিয়েছে -'। তাই মাধব দত্তের স্ত্রীর গ্রাম সম্পর্কে ভাইপোর প্রতি মাধব খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। অমলতার বাড়িতে আসার পরে মাধব দত্তের চরিত্রেও পরিবর্তন এসেছে। ঠাকুরদার সাথে আলাপচারিতায় সে পরিবর্তন চোখে পড়ে -

"মাধব দত্ত।। জান তো ভাই, অনেক কষ্টে টাকা করেছি, কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে, সে কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমার যে কিরকম লেগে গিয়েছে -

ঠাকুরদা।। তাই এর জন্যে টাকা যতই করচ করছ , ততই মনে করছ, সে যেন টাকার পরম ভাগ্য।

মাধব দত্ত ।। আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মতো ছিল, না করে কোনো মতে থাকতে পারতুম না, কিন্তু এখন যা টাকা করছি, সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
35

এই পরিবর্তন সবটাই অমলের জন্য। অমল তার পোষ্যপুত্র হলেও নিজের সন্তানের প্রতি যে মমত্ববোধ থাকা দরকার তার চাইতে কোন অংশে কম নেই মাধব দত্তের অমলের জন্য। তাই কবিরাজকে যখন সে বলে -

"আপনার ও চৈব নিয়ে আমার কী হবে বলেন তো। ও থাক্ না - কী করতে হবে সেইটে বলে দিন। কিন্তু আপনার ব্যবস্থা

বড়ো কঠোর। রোগের সমস্ত দুঃখ ও বেচারা চুপ করে সহ্য করে - কিন্তু আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।"

তখন একজন পিতার আর্তনাদ শোনা যায় সন্তানের দুঃখে।

মাধব দত্ত অমলের মত ভাবুক নয়, বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন ও বিষয়বুদ্ধি তার যথেষ্ট। তাই অমলকে সে বড় হয়ে পন্ডিত হতে বলে। নিজে তো আর হতে পারেন নি , হতে পারলে বেঁচে যেতেন - এমন মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তা শুনে অমল জানায়, সে পন্ডিত হতে চায় না - সে কবলি সব কিছু দেখে বেড়াতে চায়। অমলের এই কথাশুনে মাধব দত্তের মনে হলো অমল বাস্তব বুদ্ধিহীন। আমলের কল্পনার কথা শুনে তার মনে হয় ওগুলো অমলের পাগলামী। পন্ডিতরা তা করে না। কারণ পন্ডিতরা 'খোপা' নয় অমলের মতো পিসেমশাই এর বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় আরো পাওয়া যায়, যখন সে অমলকে বিদেশী লোকেরা যদি তাকে ধরে নিয়ে চলে যাব কোথাও ! এই ছোট - ছোট্ট কথাতেই মাধব দত্তের চরিত্রের মূলে হদিস পাওয়া যায়।

টিপ্পনী

ঠাকুরদা :

ঠাকুরদা এ নাটকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে বহন করেছে। 'ঠাকুরদা অরূপের ইঙ্গিতবহ দূতরূপে এসেছে'। আসলে ঠাকুরদার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি ও বক্তব্য নানা ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই ঠাকুরদা 'রাজা', 'অচলায়তন' - এও আছে। প্রায় একই ভাবনা নিয়ে।

'ডাকঘর' এর ঠাকুরদা রসিক। এখানে তিনি ছেলে খেপাবার সর্দার। ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তার এই বুড়ো বয়সের খেলে। নাটকের প্রথম থেকেই তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শুরুতে অমলের সঙ্গে তার আলাপ - পরিচয় ছিল না। মাধবদন্ডের মুখে ঠাকুরদা প্রথম অমলের কথা শোনে। জানতে পারে তার বাবা - মা কেউ নেই। তখন ঠাকুরদা বলেন - 'আহা ! তবে তো আমাকে তার দরকার আছে।' মাধব দত্ত জানায় যে, অমলের কঠিন অসুখের কারণে কবিরাজ তাকে শরতের রোদ - বাতাস বাঁচিবে ঘরের মধ্যেই থাকতে বলেছে। কিন্তু ঠাকুরদা যে ছেলে খেপাবার সর্দার, সে ছেলেদের ঘর থেকে বার করে আনে, তাই তাকেই মাধব দত্ত সবচেয়ে বেশি ভয় করে। ঠাকুরদা তখন জানান -

"কিন্তু ভাই, ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছু জানি।"

তখনো পর্যন্ত অমলের সাথে তার পরিচয় হয় নি। তিনি কাজকর্ম সেরে

এসে অমলের সাথে আলাপ করে নেবেন বলে চলে যান।

এরপর দেখা যায় অমলের সাথে তার আলাপ হয় ফকির বেশে। মাধব দত্ত তা দেখে অবাক হয়। ঠাকুরদা তাকে চোখের ইশারায় জানান, তিনি ঠাকুরদা নন, ফকির। মাধব দত্ত তা বুঝতে পেরে বলে -

"তুমি যে কী নও তা তো ভেবে পাই নে।"

এরপর অমলের সাথে তার দীর্ঘক্ষণ কথোপকথোন চলে। আসলে অমলকে তিনি বহির্জগতের নানান গল্প খুব আকর্ষনীয় ভাবে উপস্থিত করে। বিশেষ করে ক্রৌঞ্চদ্বীপের গল্প, যা সত্যিই চমকপ্রদ। সেই বর্ণনা খানিকটা তুলে দেওয়া হল -

"অমল ।। কৌঞ্চদ্বীপ কি রকম দ্বীপ আমাকে বলো - না ফকির।

ঠাকুরদা ।। সে ভারি আশ্চর্য জায়গা। সে পাখিদের দেশ সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওড়ে।

অমল ।। বাঃ কী চমৎকার ! সমুদ্রের ধারে ?

ঠাকুরদা ।। সমুদ্রের ধারে বৈকি।

অমল ।। সব নীল রঙের পাহাড় আছে ?

ঠাকুরদা ।। নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধ্যার সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজরঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে সেই আকাশের রঙে, পাখির রঙে, পাহাড়ের রঙে, সে এক কান্ড হয়ে ওঠে।

অমল ।। পাহাড়ে ঝরণা আছে ?

ঠাকুরদা ।। বিলক্ষণ ! ঝরণা না থাকলে কি চলে? একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর, তার কী নৃত্য ! নুড়িগুলোকে ঠুং-ঠাং-ঠুং-ঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরনাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে । কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদন্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখীগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তা হলে ঐ ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ

টিপ্পনী

দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

এই ঠাকুরদারই অন্য পরিচয় পাওয়া যায় রাজার চিঠি প্রসঙ্গে। সেই একমাত্র অমলকে রাজার চিঠির ব্যাপারে বিস্তারিত জানায় রাজাকেও ঠাকুরদা চেনেন - অমলকে তিনি তাও জানান। ঠাকুরদা বারে বারে অমলকে রাজার চিঠি আসার ব্যাপারে আশ্বস্ত্য করে। এবং মোড়ল যখন একটা সাদা কাগজ এনে অমলের সঙ্গে ঠাট্টা করে বলে এই হল রাজার চিঠি, তখন অমলকে নিশ্চিন্ত করে ঠাকুরদা। শুধু তাই নয়, ঠাকুরদা ও জানান যে চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে তিনি অমলকে দেখতে আসছেন। সঙ্গে রাজ কবিরাজকে নিয়ে। এর আগে কেউ রাজ কবিরাজ আসার কথা উল্লেখ করেননি । আসলে ঠাকুরদা গৃহত্যাগী, তিনি বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারেন। তাই তার সব খবর তিনি জানেন। তারপর রাজ-কবিরাজ আসেন, অমলকে জিজ্ঞাসা করেন, সে এখন কেমন বোধ করছে ? অমল জানায়, ভালো, খুব ভালো। এরপর অমল চির নিদ্রায় যায়। রাজকবিরাজ সব আলো নিবিয়ে দিতে বলে।মাধব দত্ত এসব দেখে শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে -

"ঠাকুরদা তুমি অমন মূর্তিটার মতো হাত জোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন। আমার কেমন ভয় হচ্ছে, এ যা দেখিছ এ সব কি ভালো লক্ষণ। এরা আমার ঘর অন্ধকারকরে দিচ্ছে কেন। তারার আলোতে আমার কী হবে।"

তখন ঠাকুরদা শুধু বলেছে -

"চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা কোয়ো না।"

এই প্রথম ঠাকুরদা মাধব দত্তের সঙ্গে এই সুরে কথা বলেছে। বোঝা গেছে তার চরিত্রের মূলকে। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের যোগসূত্র স্থাপন করেন। নাটকের মূলভাবকে বুঝতে, অমলকে বুঝতে তাই ঠাকুরদা অপরিহার্য।

মোড়ল:

মোড়ল নাটকের'টাইপ' চরিত্র । নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যতে তার প্রথম উপস্থিত দেখা যায়। কনক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-

> "মোড়ল অবিশ্বাসী নাস্তিক । পরমাত্মা যে অনাদিকাল ধরিয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যের লিপি মারফত মানব আত্মার কাছে তাঁহার মিলন বানী পাঠাইতেছেন, ইহা সে বিশ্বাস করে না। বরং এইরূপ ভাবকে সে ব্যঙ্গ ও উপহাসই করে । রাজা তাহার কাছে চিঠি লিখেবেন, অমলের এই কথা শুনিয়া মোড়ল হা হা করিয়া হাসিয়া বলে, 'রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে, তা লীখবে বই কি। তুমি যে

টিপ্পনী

তার পরম বন্ধু। কদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্ছে খবর পেয়েছি।" [রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক]

নাটকে দেখা যাচ্ছে, অমল তাকে জানলার ধার থেকে ডাকলে তার আত্মাভিমানে লাগে৷ বিরক্তহয়। কিন্তু যখন অমলের মুখে শোনে যে তাকে সবাই মানে তখন সে খুশি হয়। মূলত মোড়ল একজন অহংকারী মানুষ। সে অমলের কোন সরল কথাকে সরলার্থে নেয় না। বোঝা যায় তার মধ্যে ক্ষমতার আস্ফালন আছে। একটি বালককে পর্যন্ত সে তা দেখাতে চায়। সে অমলের কথাকে বিদ্রুপ ও করে। তার কাছে কেউই ভালো নয়। মাধব দত্তকে উদ্দেশ্য করে সে বলে -

"মাধব দত্তের বড়ো বাড় হয়েছে দেখছি। দু পয়সা কামিয়েছে কিনা এখন তার ঘরে রাজা বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই।"

কিন্তু পাঠক জানেন অমলের কিম্বা পিসেমশাইয়ের সঙ্গে রাজার কোন সম্বন্ধই নেই কিন্তু মোড়লের কথা গুলোর মধ্যে ব্যঙ্গ থাকলেও তা সব সত্যি হয়ে যায়। যাকে আমরা বলতে পারি 'Dramatic Irony'। সে বলেছিল রাজার চিঠি আজ কালের মধ্যেই আসবে , বাস্তবিকই তাই হয়। সে এতটা নিষ্ঠুর, অমলকে একটা সাদা কাগজ দেখিয়ে বলে , এটাই রাজার চিঠি। একজন মৃত্যুপথযাত্রী বালকের সাথে যে এমন আচরণ করে, সে আর যাই হোক 'মান' ও 'হুস' যুক্ত মানুষ নয়। তার পরিহাস যে কতটা বিবেকহীন তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা সাদা কাগজ এনে বলে -

"রাজা, লিখেছেন আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়িমুড়কির ভোগ তৈরি করে রাখো - রাজভবন আর আমার একদন্ড ভালো লাগছে না।"

মাধব দত্ত হাত জোড় করে এমন তরো পরিহাস না করতে অনুরোধ করে কিন্তু ঠাকুরদা একমাত্র জানেন যে মোড়লের পরিহাস করার সাধ্যই নেই।

এমন আত্মসর্বস্ব, অবিশ্বাস, অহংকারি কুপমূন্ডকরা বরাবরই মানুষের সুস্থ চিন্তাকে, সুকুমার বৃত্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। সে যখনই যার সাথে কথা বলেছে তাতেই তার নীচতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে রাজ কবিরাজের তাকে চিনতে এতটুকু অসুবিধা হয় না। তাই এই অবিশ্বাসী নাস্তিককে সে অমলের ঘর থেকে বার করে দিতে বলেছেন। এখন অমলই তার থাকার ছাড়পত্র দিয়ে জানায় যে সে অমলের বন্ধু। রাজার চিঠি সে-ই তাকে এনে দিয়েছে। তখন মোড়ল সেখানে থাকার অনুমতি পায় রাজ -কবিরাজের। এরপর দূতের কথায় যখন সে জানতে পারে রাজা তার জন্য

টিপ্পনী

মুড়িমুড়কির ভোগ প্রস্তুত করতে বলেছে, তখন মোড়ল স্তম্ভিত হয়ে যায় । অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বলেন -

> "রাজা যে অমলের মত ছোট মানুষের কাছে আসিতে পারেন, এই কথাই তো মোড়ল জাতীয় লোক বিশ্বাস করে না - তাহারা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়, তাহারা জানে যে তিনি রাজা, তিনি কেবল বড় বড় মানুষকেই দেখা দেন। কিন্তু তাঁহার যে একটি আনন্দ ঐ ছোট বালকের উপরেও অনন্ত হইয়া আছে, উহার নামে যে তিনি কোন্ অনাদিকাল হইতে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, কতবার যে লিপির আহ্বান কত প্রভাতে সন্ধ্যায় বহিয়া গিয়াছে, তাহা কি মোড়ল জাতীয় বুদ্ধিজীবী অবিশ্বাসী জানে না, মাধব দত্তের মত ঘোর সংসারীরা জানে ? একমাত্র লোক যে সেই বার্তা জানে সে ঠাকুরদা।" [কাব্যপরিক্রমা]

কবিরাজ :

কবিরাজ পন্ডিত গোত্রীয় লোক। শাস্ত্র ও পুঁথির জগতের লোক।এরা বাইরের জগৎকে বিচার করে পুঁথির নিয়মে। এরা বাইরের প্রকৃতির রূপ, সৌন্দর্যকে বোঝে না। পুঁথির মধ্যেই মানবাত্মার সমস্ত রোগ-ব্যাধির নিরাময়ের নির্দেশ আছে তাই তারা জানে বিশ্বাস ও করে। সেই বিশ্বাস মতো অমলকে সে বাইরে যেতে মানা করে , কারণ 'শরৎকালে রৌদ্র আর বায়ু দুইই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ।'এরা আসলে মানবাত্মার আত্মিক ব্যাধিকেবাড়িয়ে তোলে।

নাটকের শুরুতেই মাধব দত্ত অমলকে নিয়ে উদ্বিগ্ন । সে কথা সে কবিরাজকে জানায়। তখন কবিরাজ নিজস্ব ভঙ্গিমাব উত্তর দেন-

> "ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে, তাহলে দীর্ঘকাল বাঁচতে ও পারে কিন্তু আয়ুর্বেদে যে রকম লিখেছে তাতে তো -

অর্থাৎ আয়ুর্বেদে অমলের বাঁচার সম্ভবনা খুব ক্ষীন । তাই অমলের বাঁচা - মরা ভাগ্যেরহাতে রয়েছে। মাধব দত্তের এ সব শুনতে ভালো লাগে না। সে জাতে চায় করনীয় কী ? কবিরাজ জানায়, খুব সাবধানে রাখতে হবে, কারণ -

> "এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই ই ওই বালকের পক্ষে বিষবৎ কারণ কি শাস্ত্রে বলছে, অপস্মারে জ্বরে কাশে সামলায়ং হলীমকে"

মাধব দত্তের এগুলো অসহ্য লাগে । সে বলে, 'আপনার ব্যবস্থা বড়ো

কঠোর'।

কবিরাজ আবার শ্লোক আওড়ে বলে -

> "সেই কষ্ট যত প্রবল তার ফলও তত বেশি তাই তো মহর্ষি চব্যন বলেছেন - ভেষজ্য হিতবাক্যাঞ্চ তিক্তং আশুফলপ্রদ্য....."

এরপর কবিরাজকে আবার দেখা যায় শেস দৃশ্যে। অমল তখন শয্যাশায়ী। সেদিন অমলকে দেখে ভালো বোধ করে না। অমল নিজেকে যতই সুস্থ বলুক তা কবিরাজ মানতে চাননি। তার মনেহয়েছে অমলের ঐ হাসিটি ভলো লক্ষণের প্রতীক নয়। সমস্ত দরজা-জানলা ভালো করে বন্ধ করে দিতে বলেছে তিনি। যাওয়ার আগে চলে যান, বাড়ি গিয়ে বিষ বড়ি পাঠিয়ে দেবেন তিনি ; যদি অমলের প্রাণ বাঁচে তো সেটাতেই বাঁচবে। কবিরাজ যেখানে সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে দিতে বলেন, সেখানে রাজ-কবিরাজ এসে খুলে দিতে বলেন। মুহূর্তে কবিরাজের সব বিধান নাকচ হয়ে যায়। আসলে এই কবিরাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পুঁথি পড়া পন্ডিতদের পরিচয় কে ফুটিয়ে তুলেছেন।

টিপ্পনী

সুধা :

সুধা এ নাটকে সৌন্দর্যের প্রতীক। সুধার হাতের ফুল প্রেমের প্রতীক। প্রতীকধর্মী এই নাটকের মধ্যে পরমাত্মা, মানবত্মার যে সম্পর্ক ব্যঞ্জিত হয়েছে, সেখানে সুধাই একমাত্র প্রতীকহীন মানবীয় প্রেমের মূর্তী। মানুষ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেও পার্থিব প্রেমের প্রতিও তার ব্যাকুলতা কম নয়। সেই মানবীয়, পার্থিব প্রেমের স্বরূপ হিসেবে উঠে আসে সুধা। নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য -

> "বাস্তব 'ডাকঘর' মএ মানবচিত্তের যেটুকু পার্থিব রসও রহস্য তাহা সুধাকে কেন্দ্র করিয়াই ; অমল যে শুধু প্রতীক মাত্র হইয়া পড়ে নাই তাহা সুধার জন্যই। যবনিকা পাতের অব্যাবহিত পূর্বে নাটকের শেষ কথা 'সুধা তোমাকে ভোলেনি' এই কথাটিই নাটকটিকে একান্ত রূপকময়তা হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং ইহাতে মানব-রসের সঞ্চার করিয়াছে।"

২.৫ ডাকঘর : নামকরণ

নামকরন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সে কাব্য-উপন্যাস কিম্বা নাটক যাই হোক না কেন। যেখানে নাম নিয়ে একটু মনের

মধ্যে দোটানা দেখা দিয়েছে, সেখানেই দেখা যাচ্ছে নামের ক্ষেত্রে বারে বারে পরিবর্তণ করে মনঃপুত নামকরণ করার চেষ্টা করেছেন। কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের নামকরণ বিচার করতে গেলে যথেষ্ট সচেতন ভাবে তাকে বিচার করা প্রয়োজন ।'ডাকঘর নাটকের নাম নাটকের প্রধান চরিত্র অমলকেন্দ্রিক নয়, অনেক নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 'থীম' (Theme) কে আশ্রয় করে নামকরণ করেছেন,এক্ষেত্রেও তাই। নাম 'ডাকঘর'। 'ডাকঘর' - এর ইংরেজি অনুবাদে নাম The Post Office' ।১৯৯৪ সালে প্রকাশিত।

টিপ্পনী

'ডাকঘর' নামকরণের গূঢ় তাৎপর্য আছে। ডাকঘর হল এই বিশ্বজগৎ। চিঠি হল সেই বিশ্বজগতের সৌন্দযর্ময় বার্তা। ডাক হরকরা হল ঋতুর পরিবর্তন। কারণ ডাকহরকরাদের নাম থেকেই তা স্পষ্ট -বাদল, শরৎ। নাটকে অমল মানবত্মার প্রতীক। মানবত্মা সব সময়ই মুক্তির আনন্দ চায়, চায় বিশ্বজগৎ জুড়ে খেলে বেড়াতে । নতুন নতুন দেশ দেখতে চায়। অর্থাৎ মানবত্মা বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে চায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' সম্বন্ধে বলেছেন -

> "যখন আমি নাটকটি লিখেছিলুম, তখন কোন ভাবের প্রেরণা পেয়েছি তাই এখন মনে পড়েছে। অমল হল সেই মানুষ যার আত্মা মুক্ত পথের আহ্বান শুনেছে । মানী লোকের কড়া মতামতের খাড়া দেয়াল আর অভিজ্ঞ লোকের বিধিবদ্ধ অভ্যাসের বেড়া - এসবের থেকে সে ছাড়া পেতে চায়। কিন্তু বিষয়ী লোক মাধব দত্ত তার চঞ্চলতাকে, মারাত্মক রোগের লক্ষণ বলে ধরে নিলে তার পরামর্শদাতা কবিরাজও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে শ্লোক আওড়ে গম্ভিরভাবে মাথা নেড়ে বললে ছাড়া পাওয়াটা ওর পক্ষে নিরাপদ নয়, রোগীকে যথাসম্ভব ঘরের বন্ধনীর মধ্যে ধরে রাখা চাই। তাই এত সতর্কতা। এদিকে জানালার সামনে ডাকঘর বসেছে। অমল রাজার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকে। সে চিঠি রাজার কাছ থেকে তার মুক্তির বাণী আসবে । শেষ পর্যন্ত রাজবৈদ্য এসে দ্বার খুলে ফেললেন। প্রচলিত ধর্ম বিধিও বিষয়বস্তুর জগতে যা মৃত্যু বলে পরিচিত তাই অমলকে আত্মার মুক্তালোকে স্বচ্ছন্দ জন্মের অধিকার এনে দিল। তাই সেই নব জন্মান্তরে একমাত্র জিনিস যা সঙ্গে গেল, তা হল সুধার দেওয়া প্রেমের ফুলটি।"

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
42

তবে 'ডাকঘর' - এ রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন তা তাঁর 'খেয়া' কাব্যের রহস্যমতা এবং 'গীতাঞ্জলি' র আত্মনিবেদনের সুরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।

এ নাটক যুগসচেতন নাটক। তৎকালীন দেশীয় পরিস্থিতি, রাজনীতির কুফল প্রভাবিত করেছে নাট্যকারকে। রবীন্দ্রনাথ সি. এফ. এন্ড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে বলেন -

> "অমলের দেশের এই অবস্থায় ডাকঘর নাটকের অন্য কোন অর্থ কি আপনার মনে আসে ? ভারতবর্ষের মুক্তির বানীও রাজার দূতের হাতেই আসা চাই - ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছ থেকে নয়। এদেশ যেদিন জাগবে, কোনো দেয়ালই তাকে আর রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না, রাজার চিঠি কি এখনো সে পায়নি ?
>
> [রবীন্দ্রনাথ এন্ডরুজ পত্রাবলী : মালিনা রায় অনূদিত]

কাজেই বোঝা যাচ্ছে ডাকঘরে তৎকালিন দেশীয় পরিস্থিতি উঠে এসেছে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ নাটকের নামকরণ হয় নি। তার কারণ হল 'ডাকঘর' নামের মধ্যে দিয়ে যে ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় অমল (অর্থাৎ শুভ্র, স্বচ্ছ, নির্মল) নামের মধ্যে নিশ্চয়ই তা পায় না। ডাকঘর হচ্ছে বিপুল বিচিত্র পৃথিবী বিশ্বপ্রকৃতি। প্রচলিত অর্থে ডাকঘর বলতে যা বোঝায় এ ডাকঘর সে ধরনের ডাকঘর নয়। কাজেই 'ডাকঘর' ই নাটকের একমাত্র নাম হবে এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া অন্য কোন নাম এখানে উপযুক্ত নয়।

২.৬ ডাকঘর : সংলাপ

নাটকের যে ষড়অঙ্গ থাকে, তার মধ্যে সংলাপ একটি প্রধানতম অঙ্গ। কেননা এই সংলাপের গোটা নাট্যনবৃত্ত এবং 'থট' (Thought) কে বহন করে তার সঙ্গে চরিত্রের অন্তর্জগত তার দ্বন্দ সংঘাত সবই প্রকাশিত হয় এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে। কাজেই সংলাপ নাটকের একটি ভীষন অপরিহার্য অঙ্গ। 'ডাকঘর নাটকের সংলাপ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এই নাটকের সংলাপ কোথাও কোথাও কবিত্বপূর্ন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আছে ব্যঞ্জনাধর্মী সংলাপ। আর আছে চরিত্রানুগ সংলাপ। প্রতিটি চরিত্র আলাদা আলাদা বিশেষত্ব নিয়ে কথা বলেছে। অর্থাৎ সংলাপ দিয়ে এক একটি চরিত্র নিজস্ব সত্তাকেপ্রকাশ করেছে। কাব্যধর্মী সংলাপের পাশাপাশি আছে গদ্য সংলাপও। আর একটি বিষয় হল এ নাটকের সংলাপ হল চিত্রধর্মী সংলাপ। কথার ছবি তৈরী করেছেন রবীন্দ্রনাথ নাটকে। এই বিষয়গুলো এবার উদাহরণের সাহায্যে আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

অমলের কথা যেন এ নাটকে কাব্য হয়ে উঠে এসেছে। পিসেমশাইকে সে

টিপ্পনী

বলে -

"কত বাঁকা বাঁকা ঝরনার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব - দুপুরবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে তখন আমি বেড়াতে চলে যাব।"

কিম্বা দইওয়ালে যখন বলে -

"..... আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কিরকম করে তুমি বল, দই, দই, দই - ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।"

তখন তাকে অলঙ্কৃত চমৎকার কাব্য ছাড়া আর কিই বা বলা যায় !

ডাকঘর' নাটকের সংলাপের অধিকাংশই ব্যঞ্জনাধর্মী। বিশেষ করে রাজার চিঠি আসা থেকে শুরু করে অমলের ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত। কিম্বা ঠাকুরদার সংলাপ ; তাও ব্যঞ্জনাধর্মী এরকম খানিকটা অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে -

"রাজদূত।। মহারাজ আজ রাত্রে আসবেন।

মোড়ল।। কী সর্বনাশ !

অমল।। কত রাত্রে দূত ? কত রাত্রে ?

দূত।।আজ দুই প্রহর রাত্রে।

অমল।। যখন আমার বন্ধু প্রহরী নগরের সিংহদ্বারে ঘন্টা বাজাবে ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং তখন ?

দূত।। হাঁ, তখন। রাজা তাঁর বালক বন্ধুটিকে দেখবার জন্যে তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো কবিরাজকে পাঠিয়েছেন।

[রাজকবিরাজের প্রবেশ]

রাজকবিরাজ।। একি ! চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ ! খুললে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার, জানালা আছে সব খুলে দাও।-

অমল।। খুব ভালো, খুব ভালো, কবিরাজ মহাশয়। আমার আর কোনো অসুখ নেই, কোন বেদনা নেই। আঃ সব খুলে দিয়েছ - সব তারাগুলি দেখতে পাচ্ছি - অন্ধকারের ওপারকার তারা।"

এখানে রাজকবিরাজ সব বন্ধন খুলে দিতে বলেন তা আসলে তো

টিপ্পনী

বিশেশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য। এতদিনের গন্ডিবদ্ধ জীবন মুক্তির জন্য তৃষ্ণার্ত - সেই মুক্তির ব্যঞ্জনা এখানে ধ্বনিত হয়েছে। সব আগল খুলে যাওয়ায় অমল সত্যিকারের নির্মল, স্বচ্ছ, শুভ্র হয়ে উঠেছে। সে মুহূর্তে যেন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

এবার গদ্য সংলাপের কথায় আসা যাক। মোড়ল, প্রহরীরা যে সংলাপ বলেছে, কিম্বা দইওয়ালা,মাধব দত্ত যে সংলাপ বলেছে তা মূলত গদ্যধর্মী। তার মধ্যে বিশেষ ব্যঞ্জনা কিম্বা তত্ব নেই। মোড়লকে অমল যখন ডাকে জানালার ধার থেকে তখন সে বলে -

"কে রে ! রাস্তার মধ্যে আমাকে ডাকাডাকি করে ! কোথাকার বাঁদর এটা !"

এই সংলাপ একে বারে প্রতিদিনের কেজো কথা। আবার এরই মধ্যে দিয়ে মোড়ল তার নিজস্ব চারিত্র বৈশিষ্ট্যকেও প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাকী চরিত্রদের কথাও বলা প্রয়োজন যে প্রত্যেকে নিজেদের অবস্থানকে প্রকাশ করেছে সংলাপের মধ্যে দিয়ে। যেমন - দইওয়ালার কথার মধ্যে প্রকাশ পায় ব্যস্ততা,কোমল হৃদয়তা, মুগ্ধতা -

ক. "কেমন ছেলে তুমি ! কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন ?

খ. "..... পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব।

গ. "কিছু দেরি হয় নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।

একজন মানুষের তিন মানসিক অবস্থার তিনটি সংলাপ তুলে দেওয়া হল। এতে তার সামগ্রিক অবস্থান স্পষ্ট হল। তার সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া গেল। বাকী চরিত্র সম্পর্কেও এ কথা সমান সত্য। কবিরাজ, প্রহরী, রাজকবিরাজ, মাধব দত্ত, ঠাকুরদা সবাই সংলাপেই নিজেদের চিনিয়েছেন। যেমন সুধা। সে একটা মিষ্টি মেয়ে। তার সংলাপের মধ্যে দিয়েই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সে যেন ঝর্ণার জলের মতো গতিময়, প্রানচঞ্চল। অমল ও সুধার কথোপকথন শোনা যাক -

"অমল ।। কে তুমি মল ঝম্ ঝম্ করতে করতে চলেছ, একটু দাঁড়াও না ভাই।

বালিকা ।। আমার কি দাঁড়াবার জো আছে ! বেলা বয়ে যায় যে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অমল ।। তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না আমারও এখানে আর বসে থাকতে ইচ্ছে করে না।

বালিকা ।। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকাল বেলাকার তারা - তোমার কী হয়েছে বলো তো।

অমল ।। জানি নে কী হয়েছে , কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে।

বালিকা ।। আহা, তবে বেরিয়ো না - কবিরাজের কথা মেনে চলতে হয় - দুরন্তপনা করতে নেই, তা হলে লোকে দুষ্টু ছেলে বলবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে মন ছটপট করছে, আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই।

অমল ।। না, না, বন্ধ কোরো না - এখানে আমার আর সব বন্ধ কেবল এই টুকে খোলা । তুমি কে বলো না - আমি তো তোমাকে চিনি নে।

বালিকা ।। আমি সুধা।

অমল ।। সুধা ?

সুধা ।। জানো না ? আমি এখানকার মালিনীর মেয়ে !

অমল ।। তুমি কী কর ?

সুধা ।। সাজি ভরে ফুল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথি। এখন ফুল তুলতে চলেছি।"

সুধা তার কথাতেই নিজের পরিচয় জানিয়েছে। সে মালিনীর মেয়ে। কিন্তু তারো অতিরিক্ত যে চরিত্রমূর্তি বা ভাবমূর্তি তা ফুটে ওঠে বাকী সংলাপে সে খুব সপ্রতিভ। ভরপুর প্রাণরসে সিক্ত।

সবশেষে আর একটি কথা বলে এ আলোচনা শেষ করবো তা হল 'ডাকঘর' এর সংলাপ চিত্রধর্মী বটে। এক্ষেত্রে আমারা ঠাকুরদার সংলাপকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরবো । ক্রৌঞ্চদ্বীপের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সে চিত্রধর্মীতার পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় কথা সাহিত্যের মেজাজ -

"ঠাকুরদা ।। বিলক্ষণ ! ঝরনা না থাকলে কি চলে ! একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে, তার কী নৃত্য ! নুড়িগুলোকে ঠুংঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্‌কল্ ঝর্‌ঝর্ করতে করতে ঝরনাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। কোনো

কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদন্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করা না রাখত তা হলে ঐ ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার এক পাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।"

নাটকে সাধারণত সংলাপ যে দায়িত্ব পালন করে, রবীন্দ্র - নাটকের সংলাপ তার অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব পালন করে। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটককে বিশ্বনাট্যে পরিণত করতে পেরেছেন - তার জন্য সংলাপ একটা গুরুদায়িত্ব নিয়েছে একথা তো বলাই যায়। প্রথাগত নাট্যধারার বাইরে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাটককে মুক্ত করেছেন বাংলা সাহিত্যের গন্ডী থেকে বিশ্বের প্রান্তরে। কাজেই তাঁর নাটকের সংলাপ প্রথাগত নাটকের সংলাপের অতিরিক্ত মাত্রা বহন করবে একথা সত্য সর্বজনবিদিত ; প্রমাণিত।

টিপ্পনী

প্রশ্নাবলী

১। ডাকঘর নাটকের মূল ভাববস্তু লেখো।

২। ডাকঘর কোন শ্রেণীর নাটক ? বিচার করো।

৩। ডাকঘর নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৪। অমল চরিত্রের মধ্যে আছেসুদূরের আহ্বান - আলোচনা করো।

৫। ডাকঘর নাটকের সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করো।

৬। মাধব দত্ত, ঠাকুরদা, মোড়ল, সুধা চরিত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করো।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ডাকঘর - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। রবীন্দ্রসংগিত - শান্তিদেব ঘোষ।

৩। রবীন্দ্ররচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড সুলভ সংস্করণ)

৪। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় - ড. ক্ষুদিরাম দাস।

৫। রবীন্দ্র নাটভধারা - ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৬। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক - শ্রী কনক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়

৮। রবীন্দ্ররচনাভিধান - অনুত্তম ভট্টাচার্য।

৯। রবীন্দ্র - সৃষ্টি - সমীক্ষা - শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর - সুবন্ধু ভট্টাচার্য।

টিপ্পনী

তৃতীয় একক

কল্পনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টিপ্পনী

৩.১ দুঃসময়

৩.২ বর্ষামঙ্গল

৩.৩ স্বপ্ন

৩.৪ মদনভস্মের পর

৩.৫ বর্ষশেষ

৩.৬ বৈশাখ

'কল্পনা' ১৩০৭ বঙ্গাব্দের (১৯০০) বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'কল্পনার' কবিতা গুলো লেখা হয়েছিল। এইকাব্যগ্রন্থটি কবি তাঁর বন্ধু সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে উৎসর্গ করেন।এই ১৩০৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯০০ সালেই কবির চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল - 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'ক্ষনিকা' (১৯০০) এবং 'কল্পনা' (১৯০০)। এর মধ্যে 'কথা', 'কাহিনী' ও 'কল্পনা' তে ইতিহাস এবং প্রাচীন ভারতীয় জীবন উঠে এল। তবে একথা বলা যায়, এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ও পরিণত কাব্য 'কল্পনা;। এ কাব্যের একদিকে রয়েছে অতীত ইতিহাসকে কল্পনায় ছুঁয়ে দেখার আকুলতা, অন্যদিকে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রাণশক্তির 'বিজয়ঘোষনা'। 'কল্পনার কবিতা গুলোকে পাঠ করলে দেখা যায় কবিতা গুলিতে বিচিত্র ভাবের সমাবেশ ঘটেছে - শুধু ইতিহাস চেতনা বা জীবনের জয় গাথাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কোন ক্ষেত্রে রয়েছে সমকালীন মানবজীবন সমস্যা ও তার থেকে উত্তরণের চেষ্টা কোনটির বিষয় হয়েছে পুরান তবে তার নবরূপায়ন ঘটেছে কবির হাতে। আবার কিছু কবিতায় রয়েছে গল্পধর্মিতা। এ কাব্যের কয়েকটি ভাবধারার কবিতার পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ -

স্ব-সহায়ক সামগ্রী

১. সমকালীন পরিস্থিতিতে কবিচিত্তের প্রতিক্রিয়ামূলক কবিতা এবং জীবনের নবতর ও গভীর উপলব্ধিজাত কবিতা। যেমন - 'দুঃসময়', 'উন্নতিলক্ষণ', 'অশেষ', 'অসময়' প্রভৃতি।)

২. নিসর্গ ও মানব মানসলোকের রহস্যকেন্দ্রিক কবিতা। যেমন - 'বর্ষামঙ্গল, বর্ষশেষ, বৈশাখ প্রভৃতি।

৩. স্বদেশ প্রেম ও জনমানব কেন্দ্রিক কবিতা। যেমন - 'বঙ্গলক্ষ্মী',

‘হতভাগ্যের গান’, ‘জুতা আবিষ্কার’, ভারতলক্ষ্মী, প্রভৃতি।

৪. পুরাণের নব ভাষ্যময় কবিতা। যেমন - ‘স্বপ্ন’, ‘মদনভস্মের পূর্বে’, ‘মদনভস্মের পর’, প্রভৃতি।

৫. বিভিন্ন বিষয়ক সংগীত।

৩.১ দুঃসময়

টিপ্পনী

‘কল্পনা’ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের এক অণন্য সৃষ্টি। ‘চিত্রা’ কে পন্ডিতবর্গ শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ বলে মনে করেন। কিন্তু ‘কল্পনা’ ও ‘চিত্রা’র সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্য দাবিদার। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ‘কল্পনার সামগ্রিকতা ‘চিত্রা’র চাইতে বেশি। প্রেম নিসর্গ চেতনার প্রকাশ আরো গভীরতা পেল ‘কল্পনায়’ পাশাপাশি এখানে এক অন্তরতম গভীর চেতনা ভাষাময় হল। ‘দুসঃময়’ কবিতাটিতে এই ‘নিগূঢ়’ গভীর সমাহিত চৈতন্যের প্রকাশ ঘটল।

‘ভারতী’ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩০৫ সনের বৈশাখ মাসে ‘দুঃসময়’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশ হয়। পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত এ কবিতা। প্রত্যেকটি স্তবকেই প্রত্যয়ের ভাষা ধ্বনিত হয়েছে। আমাদের সকল সময়ই দুঃসময় । কেননা সব সময়ই লড়াই সংগ্রাম করে যেতে হয়। দুঃসময় দেখে পিছিয়ে পড়লে চলবে না। তাকে নিজের অনুকূলে আনতে হবে। পাঁচটি স্তবকের মধ্যে সেই বেঁচে থাকার লড়াই-এর কথা বারংবার ঘোষিত হয়েছে।

প্রথম স্তবকের শুরুতেই একটা মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়ার কথা রয়েছে বাস্তবের সঙ্গে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় হেরে যাওয়া। বরং এক দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে বাস্তবের সমস্ত অভিঘাতকে যুঝে নিতে তৈরী হওয়ার বার্তা রয়েছে এখানে। এখানে ‘যদিও’শব্দটি তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে। ‘যদিও’ লিখে বলা হয়েছে চারিপাশের কিছু নেতিবাচক প্রসঙ্গকে। শেষে বলা হয়েছে ‘তবু’। এই একটি ‘তবু’ অসংখ্য ‘যদিও’ কে ম্লান করে দিয়েছে আশা দিয়ে, শক্তি দিয়ে, সত্যি দিয়ে। কবি বলেছেন - সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সমস্ত ‘সংগীত’ রূপ মাধুর্য্য বন্ধ হয়ে গেছে। পাখির রূপকে বলেছেন, সঙ্গী নেই আকাশে। পাখি একা ; একাকী। ক্লান্ত চারিদিকে যেন আশঙ্কার বাতাবরণ। দিক-দিগন্ত অস্পষ্ট - ঢাকা। অনুমোচিত, অচেনা। এই পর্যন্ত কবি ‘যদিও’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর পরই একটি মাত্র ‘তবু’ দিয়ে সমস্ত আশঙ্কার অবগুণ্ঠনকে সরিয়া দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছেন আশায় ভর করে। এই আশার মধ্যে কোন আত্ম প্রত্যয়ের অভাব নেই। ‘তবু’ যোগে প্রথম স্তবকের শেষ পংক্তিটি যেন মন্ত্রের শক্তি দান করে। এবার কবির লেখার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক -

“যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,

সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,

যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,

যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,

মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,

দিক্ - দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

এই শেষ পংক্তি, এতো অশেষ প্রেরনার আধার। যত বিপদ আসুক তাকে জয় করে এগোতে গেলে এর চাইতে ভালো মন্ত্র আর কি হতে পারে -

"তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বেশ কিছু উপমা দিয়ে একটা 'দুঃসময়' কে বোঝানো হয়েছে। বলা হল যেখানে সে জীবন রূপ পাখি (বিহঙ্গ) বনের ছায়ায় গুঞ্জন তুলতে পারে এ স্থান সেটি নয়। তার পায়ের নিচে উত্তাল সাগর উচ্ছাসময়, সফেন। এই সীমাহীণ, তলহীন সমুদ্রকে হেলায় অতিক্রম করে যাবার সাহস নিয়ে তাকে জয় করতে পারলেই মিলবে নিশ্চিত গৃহকোন। তাই ধৈর্য চাই, দৃঢ়তা চাই এই সাময়িক দুঃসময়কে অতিক্রম করতে।

পরের স্তবকে কবি আরো প্রত্যয়ী, আরো সাহসী, যা আঘাত আসুক তাকে ততোধিক প্রত্যাঘাতে জয় করতে হবে যেন এ বার্তাই ঘোষিত এখানে। এখনো সেই আলোকময় সকাল আসেনি, রাত্রি এখনো গভীর। বিশ্বজগৎ প্রহর গুনছে নবারুণের আশায়। বিপদ - জীবনে আসে, আসবেও কিন্তু তাএ বিচলিত না হয়ে সুসময়ের অপেক্ষা করার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে এখানে। দূর দিগন্তে বাঁকা চাঁদ দেখা যায় অর্থাৎ সেই সুকালের সকাল আসন্ন। দুঃসময় আর স্থায়ী হতে পারবে না। তাই হে জীবন পিয়াসী, হে বিহঙ্গ নিজের লড়াই থামিয়ে দিও না। বন্ধ কোরো না তোমার অগ্রগমনের পাখা। জয় হবেই। এখানে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যউল্লেখ্য -

> "[কবিতাটি] সন্ধ্যার শঙ্কাসঙ্কুল বিষাদে পূর্ণ। সন্ধ্যার লগ্নটি সন্দেহের মুহূর্ত : একদিকে দিবসের স্পষ্ট প্রখর আলো নিবিয়া আসিতেছে, অন্যদিকে নক্ষত্র-ভাস্বর শান্ত নিবিড়তা এখনো প্রকটিত হয় নাই, এমন একটি দ্বিধার ক্ষণ সন্ধ্যা। ..... এই দ্বিধার মুহূর্তে কবির অপেক্ষাকৃত জড় অংশ ভীত ও সন্দিগ্ধ, কিন্তু তবু তাঁহার অগাধ বিশ্বাস নিজের অন্তরতম কবি প্রকৃতির প্রতি।"
>
> [রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ -১]

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এর পরের স্তবকেও কবির সতকর্তা বাণী উচ্চারিত জীবন যোদ্ধাদের প্রতি যেমন ভাবে চর্যাকার বলেন -

"বান-ডাহিন মিলি মিলি মাঙ্গা
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।।"

ঠিক তেমনি কবি বলেন

"ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা - পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা - পানে উঠে ধাইয়া।

অর্থাৎ আকাশের তারাগুলো তোমার দিকে চেয়ে কিছু ইঙ্গিত করে। কি ইঙ্গিত ? নিশ্চয়ই তা খুব সুখকর কিছু নয় নিশ্চয়ই। তা জীবনের পক্ষে নিশ্চয়ই আদরনী নয়। তেমনি নিছে মৃত্যুফাঁদ পাতাই রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারই মধ্যে দিয়ে তোমায়, হে বিহঙ্গ, জীবন রসিক এগিয়ে যেতে হবে জীবনের পথে।

একেবারে শেষ স্তবকে কবি চলাটাকেই একমাত্র ধ্রুব ধরেছেন। গতিই জীবনের নামান্তর, এদিকেই মতামত ব্যক্ত করেছেন। ভয় নেই, স্নেহ নেই, ভাষা নেই, গৃহ নেই ফুলসজ্জা রচনার, যা আছে তা হল -

"আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ - অঙ্গল
উষা-দিশা-হারা নিবিড় তিমির আঁকা-
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

আসলে এ কবিতা দুঃসময়ে কবিতা নয়, দুঃসময়কে চিনিয়ে দেবার কবিতা। চিনে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে মুক্তি লাভের কবিতা। জীবনের গতিময়তা কবিতা। ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি - ভঙ্গির নবতর চেতনার কবিতা। সে কারণেই গানের ধ্রুবপদের মতো বারে ফিরে ফিরে এসেছে 'ওরে বিহঙ্গ .....' এই পংক্তিদুটি। রবীন্দ্র-গবেষক অজিত কুমার চক্রবর্তী কবিতাটি প্রসঙ্গে বলেন -

> "বিগত জীনের স্মৃতিতে কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নূতন জীবন যাত্রায় পক্ষবিস্তার করিতে যাইতেছেন। কবি জীবনের এমন এক অবস্থার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাহার পূর্ণ পরিচয় তিনি অবগত নহেন ; কিন্তু পিছনে ফেলিয়া আসা ঐশ্বর্যের দিকে চাহিয়াও তিনি পরিতৃপ্তি পাইতেছেন না।"
>
> [কার্যপরিক্রমা]

৩.২ বর্ষামঙ্গল

নিসর্গ মহিমার অপরূপ সৌন্দর্যের কবিতা 'বর্ষামঙ্গল' । কবিতাটি কবি জোড়াসাঁকোতে বসে লেখেন ১৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। ইংরেজি ৯ এপ্রিল ১৮৯৭। 'ভারতী' পত্রিকার আষাঢ় ১৩০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নামেই স্পষ্ট যে এর বিষয় বর্ষা। 'কল্পনা;'র অনেকগুলি কবিতায় ঋতুর বর্ণনা আছে। তবে কবির প্রিয় ঋতু বর্ষা ও বসন্ত। 'বর্ষামঙ্গল' - এ বর্ষার আবাহন করা হয়েছে। এ কবিতা রচনার কারণ খুঁজলে মনে হতে পারে যে সেদিন আসন্ন কালবৈশাখীর সজ্জিত রূপ দেখে কবিচিত্তে প্রাচীন ভারত জেগে ওঠে। কালিদাস - বানভট্ট - জয়দেব কবিকে হয়তো অনুপ্রাণীত করে থাকবেন। তার গন্ধ আমরা কবিতাতে পাই। মেঘদূত, ঋতুসংহার, কাদম্বরী, গীতগোবিন্দের সুর মাঝেমাঝেই শোনা যায় ৫৬টি ছত্রে এবং ৮টি স্তবকে সম্পন্ন এ কবিতায়।

প্রথম স্তবকের শুরুতেই বর্ষাকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে

জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভর ভসে

ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা

শ্যামগম্ভীর সরসা।"

ভৈরবের রূপে সে আসছে কিন্তু তার ভয়ঙ্কর মূর্তি বৈশাখের মতো নেই আর। পৃথিবীর মৃত্তিকার বুকে জলসঞ্চন করে সোঁদা গন্ধ জাগিয়ে সে আসছে। সে নবযৌবনা' এবং 'শ্যামগম্ভীর'। তবে তার এই গাম্ভীর্যের মধ্যে আছে সরসতা। এমন বাদল দিনে প্রকৃতিতে যে পরিবর্তণ দেখা দিয়েছে তারও বর্ণনা দিয়েছেন কবি। মেঘের 'গুরুগর্জণে' নীল অরণ্য শিহরিত হয়েছে। উতলা হবে কলাপী অর্থাৎ ময়ূর তার পুচ্ছ মেলে দিয়েছে।

"গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,

উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।"

শুধু প্রকৃতি জগতেই নয়, বর্ষার আগমনে মানব মনে হিন্দোল জেগেছে। 'মেঘদূত' এর পূর্বমেঘের অভিসারিকা রমনীদের কথা মনে পড়ে যায় এ বর্ণনা শুনে -

"পথিক জন বধূনাং তদ্‌বিয়োগাকুলানাম।।"

এবার কবি সরাসরি 'ঋতুসংহার' - এর অভিসারিকাদের প্রসঙ্গ আনেন। তাদেরও এ কাব্যের সঙ্গি করে নেন। 'ঋতুসংহার' এ অভিসারিকার বিদ্যুতের আলোয় দেখে দেখে পথ চলার কথা আছে -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"তড়িৎ প্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ প্রয়ান্তি রাগাদ্ অভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ।"

বর্ষাভিসারে অভিসারিকা প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে সংকেত কুঞ্জে আসে। রাধা-কৃষ্ণের লীলায় অভিসার যাত্রার ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে বারে বারে। নীল বসনা রাধা। আকাশে মেঘের নীলিমা মন উচাটন। জ্ঞানদাস বর্ণনা করেন-

"চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি

পরাণ সহিত মোর।"

রবীন্দ্রনাথ এ কবিতায় বলেন -

"ঘনবন তলে এসো ঘননীলবসনা।"

এরপর শকুন্তলার নব অনুরাগের চিত্রের প্রসঙ্গ আনেন কবি। এরই সূত্রে গীতগোবিন্দের রাধাকৃষ্ণলীলার একটা রূপ মূর্চ্ছনার চিত্রের প্রতিফলন দেখা যায় এখানে। মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী, শঙ্খ, হুলুধ্বনি, কুঞ্জকুটিরে আগমন ইত্যাদি অনুসঙ্গ ঐ গীতগোবিন্দের প্রসঙ্গকে জানিয়ে দেয়। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' তে আছে ভূর্জপাতায় নবগীত রচনার কথা ; পদ্মপাত্রে পত্রলিখন প্রসঙ্গ আছে শকুন্তলায়।

আসলে কবিতাটি বর্ষাবন্দনা। কিন্তু সেই বর্ষাকে নিয়ে কবি ঘুরে বেড়ান প্রাচীন সাহিত্যের জগৎ। তাই এবার তিনি বলেন নববর্ষা এসেছে হে অভিসারিকাগণ তোমরা দেহশোভাকে বর্ধিত করো। তনুশ্রী হয়ে উঠতে বলেন তাই কবি -

"কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,

ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি, লয়ে পরো করবী,

কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,

অঞ্জন আঁকো নয়নে।"

অভিসারিকা নায়িকা তার মনের আনন্দ প্রকাশ করে হাতের কঙ্কন বাজিয়ে পালিত শিখী (ময়ূর) নৃত্য করিয়ে। ময়ূরের এই নৃত্যের কথা 'ঋতুসংহার' এ আছে। মেঘদূতের উত্তর মেঘ - এ ময়ূরকে নৃত্য করাতে গিয়ে নারীর হাতের বালার অনুরণনের কথা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত 'মেঘদূত' এই অনুবাদে উঠে এসেছে এভাবে -

"তাহারে নাচায় প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া,

রণ রণ বাজে তায় বালা।"

অভিসারের প্রস্তুতি শেষে পথে বেরিয়ে আসে অভিসারিকা। দেখে সে ঘরে ঘরে দুয়ার রুদ্ধ। জনহীন পথ যেন ক্ষুব্ধ বাতাসে কেঁদে ফিরছে। কোন গৃহে একা

বিনিদ্র পুরকামিনী শুয়ে রয়েছে । যুথী পুষ্পের সৌরভ সজল সমীরে মিশে ছড়িয়ে পড়েছে। দাদুরী অবিরাম ডেকে যাচ্ছে। এমন নিশি কি ভোলা যায়।

অভিসারের চরম সার্থকতা মিলনে। বর্ষার সে মিলন শেষ হয় ঝুলনের মধ্যে দিয়ে। তাই কবি বলে -

"নীপাশাখে সখী ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।"

কালিদাসের কাব্যে বর্ষা বিরহের প্রতীক হয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষামঙ্গল'-এ বর্ষাকে মিলনের আনন্দের মাত্রায় ধরেছেন, কবি বলেন শত শত যুগ আগে থেকে অসংখ্য কবি বর্ষা প্রকৃতিতে মানব-মানবীর মিলনের অনুভূতিকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। তার সৌরভ বর্ষার মতোই সৌরভময়।

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে

ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে

শতেক যুগের গীতিকা

শত শত গীত মুখরিত বনবীথিকা।"

'বর্ষামঙ্গল'এ কবি এঁকেছেন মানব-মানবীর চিরন্তন মিলনের চিত্র, বর্ষার আগমনের অনুষঙ্গে । এবং তা হয়ে উঠেছে এক অনন্য সৃষ্টি । রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ নীহাররঞ্জন রায় যথার্থই বলেছেন -

"ইহার ধ্বনি ও ছেদ, পদ-বিন্যাসে, শব্দে-চয়নে ও চিত্র-গরিমায় মত্ত নববর্ষার যে সুগভির রূপ ফুটিয়ে উঠিয়াছে তাহার পরিচয় ইহার শব্দার্থের মধ্যে পাওয়া যায় না, যে মোহ - মাধুর্য ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে তার সৃষ্টি হইয়াছে অতীত ভারতের বর্ষা - বিজড়িত স্মৃতি- ঐতিহ্য হইতে, তাহার উপাদান জোগাইয়াছে শতেক যুগের কবি; ঘনবর্ষার ধারায় যে গীত ধ্বনিত হয় তাহা ত এই কবিদের গীত -"

[রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভুমিকা]

টিপ্পনী

৩.৩ স্বপ্ন

কবি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে কাব্যে 'স্বপ্ন', 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাটি ১৩০৪ বঙ্গাব্দে ৯ই জ্যৈষ্ঠ রচিত এবং ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এই 'স্বপ্ন' কবিতাটি মূল প্রেরণা কালিদাসের 'মেঘদূত' কাবটি।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
55

কবিতাটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে শুধু অনুভবের প্রকাশ নয় এতে রয়েছে এক ধরনের অন্বেষন, চিরকাল ধরে কবিরা এ অন্বেষন করে চলেছেন, 'স্বপ্ন' আর কল্পনার তরীতে বসে রবীন্দ্রনাথ এক ধূসর জগতে যাত্রা করেছেন । কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে যেমন রয়েছে যাত্রা পথের বর্ণনা ও দিশা, 'স্বপ্ন কবিতাতেও অধরা

মাধুরীকে আপন করে পাওয়া প্রত্যাশী কবি তেমনি করেই দিয়েছেন যাত্রা পথের বর্ণনা ও লক্ষ্যে পৌঁছনোর আনন্দ ঘন স্বাদ।

কালিদাসের সৌন্দর্যলোক 'স্বপ্ন' কবিতায় সজন করেছে এক অনিন্দ্যসুন্দর সৌন্দর্যলোক। কালিদাসে মেঘদূত' কাব্যে আছে শিপ্রা নদীর কথা যাকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল মেঘ বিরহী যক্ষের ব্যাকুল বার্তা নিয়ে বিরহিনী যক্ষ প্রিয়ার কাছে। সে বহুকাল আগের কথা, স্বপ্নের অবকাশে সে কাল এ কালকে মিশিয়ে দিয়েছেন কবি। ফলে স্বয়ং কবি হবে উঠেছেন যক্ষ আর যার উদ্দেশ্যে এ চলা সেই পরমা হয়ে উঠেছে প্রিয়া -

টিপ্পনী

"মোর পূর্ব জন্মের প্রথমা প্রিয়ারে।"

এর পরেই কবি সেই প্রথমা প্রিয়া বর্ণনা দিয়েছেন, এই রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' এর 'উত্তর মেঘদূত' এর প্রিয়ার বর্ণনাকে হুবহু অনুসরণ করেছেন।

"হস্তে লীলা কমলম্ অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং

নীতা লোধ্র প্রসব রজসা পান্ডুতাম আননে শ্রীঃ।"

ইত্যাদি

আর স্বপ্ন কবিতায় আছে -

"মুখ তার লৌধ্র রেণ, লীলা পদ্ম হাতে,

কর্ণমুলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,

তনু দেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা

চরণে নুপূর খানি বাজে আধা আধা।"

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে প্রিয়ার রূপ বর্ণনায় কবি কালিদাসের রঙের থালা থেকে ধার নিয়েছে রঙ, নূপুরের শব্দ এবং বসন্তের দিনেপথ চিনে চিনে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাওয়ার বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিতার ভাব সাদৃশ্য চোখে পড়ে। স্বপ্নালোকে যাত্রা তাঁর সফল হয়েছিল ঋতুরাজ বসন্তের উন্মাদনা তাদের মিলনেআনুকূল্য করেছিল।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
56

কিন্তু সময় গিয়েছে অতিক্রান্ত হয়ে মহাকাল মন্দিরের প্রসঙ্গে এসেছে এখানে মেঘদূতে 'পুর্বমেঘ' এ মহাকাল মন্দিরের কথা আছে -

"আপনি স্নিনজলধর মহাকালম্ আসাদ্যকালে

স্থাতব্যং নয়ন বিষয়ং যাবদ্ অত্যোতি ভানুঃ।"

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন প্রথম প্রিয়া অন্বেষন করতে করতে তিনি তাঁর গৃহের কাছে পৌঁছেছিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। মহাকালের মন্দিরে বেজে

চলেছে সন্ধ্যা আরতি , মেঘদূতের 'পূর্বমেঘ' আছে জনশূন্য পন্য বীথির কথা, বিশাল অট্টালিকা ঢাকা পড়ে আছে গাঢ়তর অন্ধকারে। উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনায় এ তথ্য উপস্থাপিত, তবে সেখানে আছে, পথে এসে পড়েছে চাঁদের বিকীর্ণ আলোকরেখা। এখনে প্রতিবিম্বিত হয়েছে "অন্ধকার হর্ম্য' পরে "সন্ধ্যারশ্মি রেখা।"

এরপর বর্ণিত হয়েছে প্রিয়ার ভবনের অপরূপ রূপ সে ভবণে বাঁকা সরু পথ দিয়ে যেতে হয়। তা দুর্গম নির্জন। দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র তার দুদিকে দুটি নীপতরু আর তোরণের সামনে সিংহের মূর্তি বসানো। প্রিয়ার ভবনের এই রূপ বর্ণনায় কবি 'মেঘদুত' কাব্যে উত্তর মেঘের দ্বারস্থ হয়েছেন। সেখনে প্রিয়ার ভবনের দ্বারে আঁকা রয়েছে শঙ্খপদ্ম -

"দ্বারপান্তে লিখিত বপুষৌ শঙ্খ পদ্মৌ।

প্রিয়ার গৃহের কপোত গুলির কথাও জানাতে ভোলেননি কবি -

"পরিয়ার কপোত গুলি ফিরে এল ঘরে,

ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্নদন্ড পরে।"

এই বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ 'উত্তরমেঘ' থেকে দিয়েছেন । এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব হয় মালবিকার। সুতরাং 'সপ্ন' কবিতায় যে ইন্দ্রিয়ঘন পরিবেশ প্রথম থেকে লক্ষ্য করা গেছে এখানে যেন আরো কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রিয়া কোনো বিদ্রোহী নন। এক দেহী রমনী, তার একটা নাম ও আছে। যা তাঁর অস্তিত্বকে প্রকট করেছে। সে মালবিকা যে তাঁর গৃহ দ্বার প্রান্তে দ্বীপশিখা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের প্রসঙ্গে দেহী বিদ্রেহীর কথা ওঠে বারবার । 'স্বপ্ন' কবিতায় স্বপ্নের মধ্যে হলেও কবি ভেঙেছেন সেই দেহহীনতার প্রাচীর কে। প্রথমা প্রিয়া মালবিকা সন্ধ্যাতারার মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছে - আর এরই মধে ফুটে উঠেছে একটি রোমান্টিক অনুভব যাকে বহুমাত্রিকতা দিয়েছে সেই রমনীর রূপর্চা এবং বেশবাস এবং তারপর প্রিয়া এগিয়ে এসে হাতের প্রদীপখানি দ্বারের পাশে রেখে পথশ্রান্ত কবির হাত স্পর্শ করে এবং জানাতে চায় - 'হে বন্ধু আছ তো ভালো?" এই একটিমাত্র প্রশ্ন ঐ কুশল জিজ্ঞাসা যেন অন্তর দিয়ে অন্তরকে স্পর্শ করা। আর তাতেই ভাষা হারিয়ে যায় কবির । যেই মালবিকার কাছে দাঁড়িয়েছেন তিনি তাঁর নাম ও হারিয়ে যায় ভাষাহীনতার স্রোতে । দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে গেছেন কথা আর সেই মনের অনুভব ভাষায় রূপ পেতে না পেরে -

'অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিষ্পন্দ নয়ানে।"

এখানেই আবার বস্তুজগৎ ভাবজগৎ মিলেমিশে একাকার হয়েছে। এরপর অসাধারণ একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবির হাতে প্রিয়ার হাত স্পর্শের দৃশ্যটি বর্ণিত হয়েছে -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি

আমার দক্ষিণ করে কুলায় প্রত্যাশী

সন্ধ্যার পাখির মতো।"

প্রিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করেছিলেন কবির কাছে। এই দৃশ্যে ফুটে উঠেছে ইন্দ্রিয়ঘণ মিলনের কথা। নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিলে যাওয়ার কথা তারপর যে মুহূর্তে মিলন শেষ সেই মুহূর্তেই ছেদ ঘটে যায় কবির সঙ্গে প্রিয়ার। এ বিচ্ছেদের ফলে গভীর ভাবে দুরত্ব অনুভূত হয়। শিপ্রা নদীর তীরে শিবের মন্দিরে আরতি যায় থেমে।

কালিদাসের কবিতার রবীন্দ্র কবিতায় তৈরি করেছে এক রোমান্টিক বাতাবরন। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই পূজারি। দুজনেই মনে করেন মিলনে নয় বিরহে প্রেমের পরিপূর্ণতা। সেই উপলব্ধির ক্ষেত্রে দুই মহাকবির অনুভূতি অভিন্ন। কিন্তু কালিদাসের বার্তা যেখানে প্রিয়ার কাছে বয়ে নিয়ে গেছে মেঘ, সেখানে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন স্বয়ং, কালিদাসের কাব্যে আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘের আগমনে ব্যাকুল হয়েছে সক্ষ। আর এমন কোন প্রাকৃতিকঘটনা নয় রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' স্বপ্নে শুরু স্বপ্নভঙ্গে শেষ কিন্তু সেই ভাঙ্গা স্বপ্নের রেশটুকু হৃদয়ে যেন বাজাতে থাকে। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন - "..... বাস্তব থেকে এই দূরত্বের ফলে কবিতাটি নিস্তেজ হওয়া দূরে থাক, পেয়েছে পরাবাস্তবের যথার্থ্য। আমরা যেন স্মৃতির এক সুদীর্ঘ গলি পার হয়ে চলেছি ; সেখান ছড়িয়ে আছে অতীতের সৌরভ, আলোর চেয়ে গাঢ়তর অন্ধকার, আমাদের সব ক্ষতি ও ভালবাসার বর্ণনা, এই যাত্রা হয়ে ওঠে হারানো সুখ ও যৌবনের জন্য সন্ধান, যাতে আমরা সকলেই সহযাত্রী। কোলরিজের 'জানাডু' -র মতো এই উজ্জয়িণী ও সেই স্বর্গ, যার জন্য মানবত্মার আকুতি অমর, কিন্তু যা চিরকাল আমাদের নাগালের বাইরে থাকবে।"

[কবি রবীন্দ্রনাথ]

৩.৪ মদনভস্মের পর

স্ব-সহায়ক সামগ্রী

কবিতাটি রচিত হয়েছে ১২ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, শান্তিনিকেতন, বোলপুরে বসে। ইংরেজি ২৫ মে ১৮৯৭ সাল। 'ভারতি'র আশ্বিন ১৩০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত। এ কবিতার অবলম্বন কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্যের অংশ বিশেষ। কবিতাটি রবীন্দ্র কাব্যমালার রত্নখন্ড বিশেষ। এ কাব্যের ছন্দ ব্যবহার প্রয়োগ সম্বন্ধে ড. সুকুমার সেন বলেন -

" মদনভস্মেরপূর্বে' এবং 'মদনভস্মের পর' কবিতা দুইটির ছন্দে জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' এবং ছড়ার 'হাত ঘুরলে নাড়ুদেব' ছন্দের অপুর্ব অনুসরন।"

[বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস -৩]

রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির শুরুতে কিছু কথা প্রশ্নচ্ছলে তুলে ধরেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন মদনকে শিব ভস্মীভুত করে তার ওপর কামের আধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটে যায় উল্টো। কামের বিস্তর আরো বেড়ে যায়, এতদিন যে কাম ছিল শরীরের সীমায় বাঁধা, তাকে ভস্মকরে দেওয়ায় কামের বিস্তার ঘটে সমগ্র বিশ্বময়, কামের সান্নিধ্যে শুধু মিলনের আনন্দ লাভ হয়, তা কিন্তু নয়, বিরহ-বিচ্ছেদ-বেদনাও প্রবলতর হয়ে ওঠে। কিন্তু রতির কথা কে ভাববে? কে তার যন্ত্রণার দিকে আলোকপাত করবে? কবি কিন্তু ভেবেছেন-

"ব্যাকুল তার বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি

অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।"

রতির মদন বিচ্ছেদের বেদনা গভীরতর। তার সে বিলাপে বিশ্বভুবন ভরে ওঠে। চারিদিকে সেই বেদনা বিলাপের অনুরণন। ফাগুন' মাসে সেই বিচ্ছেদ বেদনা সংগীত আরো বেশি করে বাজে -

"ফাগুন মাসে নিমেষ -মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে

শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।"

রতির যন্ত্রনাকে সহানুভূতি (Empathy)র দৃষ্টিতে দেখেন কবি। তিনি লক্ষ্য করেছেন বিরহকাতরা তরুনী আনমনা হয়ে বসন্ত দিনে একা বসে থাকে। বকুল গাছের পাতায় ভ্রমরের গুঞ্জনে সে বেদনার কোন ভাষা প্রকাশিত হয়। সুর্যমুখী আকাশের দিকে তাকিয়ে তার বল্লভকে কিভাবে স্মরণ করে। নির্ঝরিনী কোন অনন্ত পিপাসা বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে। কবি এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। অদৃশ্য মদনের স্পর্শ যে কবিচিত্তকেও দোলা দিয়েছে তার পরিচয় কবি নিজেই দিয়েছেন এভাবে -

"বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত

নয়ন কার নীরব নীল গগনে।

বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,

চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।"

এই কথাতেই স্পষ্ট কবির মনে মদনের প্রভাব পড়েছে। কবি দেখেছেন, জ্যোৎস্নালোকে কার বসন লুণ্ঠিত, নীল আকাশে নয়ন নীরব কার, কার মুখ কিরণচ্ছটায় ঢাকা, নরম ঘাসের ওপর কার পদক্ষেপ ! এতো সেই মদনরই প্রকাশ। এরপর কবি অনুভব করেন, কে যেন তার অন্তরকে উল্লসিত করে তোলে, হৃদয়কে তা লতার মতো জড়িয়েধরে।

'কুমারসম্ভব' - এ ব্যক্ত হয়েছে মদনের বিচিত্র কর্মধারা। মদনভস্মের পর রতির বিলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে প্রিয় বিরহের ব্যাকুল বেদনা।

টিপ্পনী

কালিদাসের সেই বিষয় ভাবনাকেই সম্মান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যে। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি সেই বিষয়ের বিস্তারও ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামতকে তুলে ধরা যেতে পারে -

"কবিতাটিতে রতি বিলাপের বিপরীত দিকটি উদ্‌ঘাটিত। প্রেমের ন্যায় মানবের সনাতন হৃদয় বৃত্তিকে উৎসাদন করা যায় না। প্রনয় দেবতাকে ভস্মসাৎ করিলে উহার সম্মোহন শক্তি আরও দুর্লক্ষ্য ভাবে দূরবিকীর্ণ ও প্রতিরোধ্য হয়। ..... প্রথম কবিতাটিতে (মদনভস্মের পূর্বে) কল্পনার যে রুপ উদ্ভানী ও আত্মাবিস্তারমূলক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টিতে (মদনভস্মের পর) তার তুলনায় পরিচিত ভাবেরই প্রাধান্য।"

[রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা]

টিপ্পনী

৩.৫ বর্ষশেষ

'বর্ষশেষ' কবিতাটির শিরোনামের পরেই কবি রচনা কাল জানিয়ে দিয়েছেন ১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত'। 'ভারতী' পত্রিকার চৈত্র ১৩০৫ সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি রচনার দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে ১৩৩২ সালের শান্তিনিকেতন পত্রিকায় কবি রচনার উৎস প্রসঙ্গে জানান -

"১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিন শেষের মুহূর্তে একটা প্রকান্ড ঝড় দেখেছি। এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা কিছু পুরাতন ও জীর্ন তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে - ঝড় এসে শুনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনিভাবে চিরনবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোর আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুমম, অভ্যস্ত কর্ম নিয়েএই যে এতদিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হল না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায় তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতয় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিৎকে নাড়া দিয়ে গেল ; আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে।"

আবার 'আত্মপরিচয়' এর 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি বলেছেন -

"..... এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল তাই পূর্ব জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগলল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল সে তাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্র বেশে কে দেখা দিল ? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার

'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।"

[গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী - ৪(সুলভ সংস্করণ)]

কবির নিজের কথা শোনা গেল। এবার কবিতাটির দিকে তাকানো যাক। কবোতাটির প্রথম দুটি স্তবক জুড়ে ঝড়ের আগমনের বর্ণনা। ঈশান কোণে জেগে ওঠা মেঘের বা আবন্ধহীন রুপে ছুটে আসা, গ্রামের প্রান্তে বাঁশবনের দীর্ঘছায়া সঞ্চারিত। মেঘের সেই রূপ দেখে গরুরা চঞ্চল হয়ে পড়েছে, চাষিও কাজ ফেলে ছুটে চলেছে। মাঝিরা নৌকার পাল নামায় তড়িঘড়ি। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলছে। এই চিত্রে আমাদের মনে হয়, ঝড়ের আগমনের চিত্র অঙ্কনই বুঝিবা এখানে মুখ্য। কিন্তু তা নয় কবিতটি কবি নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এক শিল্পময় উৎকর্ষতায় নিয়ে গেছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

"এই কবিতাটি কবির অন্তর্জীবনের ঝড়ের কথা। ..... এই কবিতার প্রতভেকটি বিশেষন ও প্রতভেকটি শব্দ নূতন নূতন অর্থে পূর্ণ।"

[রবিরশ্মি - পূর্বভাগে]

শেলীর 'Ode to the west Wind' কবিতার সঙ্গে এ কবিতার কিছু সাদৃশ্য আছে বলেঅনেক সমালোচক মনে করেন। শেলীর কবিতায় উচ্চারিত হয় জীর্ণ জীনের অবসানে নতুন জীবনের আগমনীর কথা। রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাও সেই ভাবনাকে ব্যক্ত করে -

"উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা

বিপুল নিশ্বাসে।"

কিম্বা -

"উড়ে হোক ক্ষয়

ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত

নিষ্ফল সঞ্চয়।"

ঝড়ের দুই রূপ একটি ধ্বংসের অন্যটি নতুন সৃষ্টির। এই দুটি রূপের কথাই বর্ণিত হয়েছে এখানে। এছাড়া রুদ্রদেবেতার - শান্তম, শিবম রূপ ও বর্ণিত হয়েছে কবিতায়। রুদ্রের মধ্যেই কবি কল্যাণময় বিশ্বদেবতার একটা রূপকে অনুভব করেছেন।

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে আছে নূতনের আগমন বার্তা। নূতন অর্থে নববর্ষ। পুরাতন বৎসরের মলিনতা ও বেদনাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। কবি বলেন -

"হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি

টিপ্পনী

পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে -

প্রতিবার নূতন বছর আসে । চৈত্র শেষে আসে বৈশাখ । কিন্তু এবার অন্যরকম ভাবে এসেছে। কবি নিজেও সে কথা জানান -

"এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশ - হিল্লোলে

পুষ্প দল চুমি"

টিপ্পনী

এবার এসেছে বিজয়ী রাজার মতো, পুরনোকে ধ্বংস করে, নূতনের বার্তা নিয়ে নববর্ষকে 'কুমার' সম্বোধন করে বলেছেন -

"এ কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান"

সব জীর্নতা, মলিনতা দূর হয়ে যাক। নূতন আসুক। কোন বন্ধন যেন আর পিছনে বাঁধতে না পারে। তিনি নুতনকে এভাবে আহ্বান করেন কারন তিনি দেখেছেন জীবন 'শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি' । নূতন পথে যাত্রায় কেউ আগ্রহী নয় । কারন অজানা, অচেনা বিপদে কেউ বা চায় ঝাপ দিতে । মানুষ ক্ষুদ্র গন্ডীতেই আবদ্ধ থাকতে চায়। পারিপার্শিক দ্বন্দ্ব কলহেই দিনাতিপাত করে। কবিমন ক্ষুব্ধ হয় এতে, বেদনাতুর হয়। নিজের সেই অন্তর্বেদনাকে তিনি রূপ দেন এই ভাবে -

"সহে না সহে না আর জীবনেরে খন্ড করি

দন্ডে দন্ডে ক্ষয়।"

তই তিনি অনন্তলোকের সঙ্গে অন্বিত হতে চাইছেন, মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চাইছেন । আসলে ক্ষুদ্রতা, নীচ তাকে ত্যাগ করে বৃহতের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছেন।

কবিতাটিতে কবি মনের তিনটি পর্যায়কে পাওয়া যায়, প্রথম পর্যায় পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিকুলতায় ক্ষোভের জাগরণ, দ্বিতীয় অংশে রুদ্রদেবের তান্ডব । প্রকৃতির বুকে কবি প্রত্যক্ষ করলেন কালবৈশাখীর মাধ্যমে সেই তান্ডবকে । তৃতীয় স্তরে প্রশান্তির ভাব বিরাজমান।

"শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লি রবে,ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছাসে,

মুক্ত বাতায়নে

বৎসরের শেষ গান সঙ্গে করি দিনু অঞ্জলিয়া

নিশীথ গগনে।"

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
62

'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থে ক্ষুদিরাম দাস এ কবিতার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে -

"কবি কল্পনার বিপুল প্রানোচ্ছালতা ও বিরাট ব্যাপ্তি ও বিস্তার,

ছন্দোসংগীত ও শব্দৈশ্বর্যের উপর অসাধারণ অধিকার পাঠকের মনের গভীর সংক্রামিত হইয়া তাহার বিচারবুদ্ধিকেকিছুটা অভিভূতকরে । ..... কবিতার ভাববিন্যাসের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষন করিলে ধারণা জন্মে যে কবি কালবৈশাখীর তান্ডব শক্তি সমস্ত কল্পনা দিয়া গ্রহণ ও প্রকাশ করিয়াছেন ও উহার মানস প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার কোন সুদৃঢ় প্রতভব জাগে নাই। তিনি ঝটিকা ও দৃষ্টিকে মনের মধ্য দিয়া জড় জগতের সহিত সমান সমান উদ্দাম শক্তিতে প্রবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু তুমুল বিপর্যয়ের শেষ পরিনতিটি তাঁহার অন্তরে সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিভাত হয় না। চিরাভ্যস্ত পুরাতনের বিলুপ্তি ও নব জীবনবোধের আবাহন ইহাই সাধারণভাবে তাঁহার কাম্য। অন্তরে এই নবীনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কখনও জীবনের স্ববিরোধমুক্ত নির্মল তাৎপর্যবোধ, কখনও নিগূঢ় আত্মানুসন্ধান, কখনও দুঃসাহসিক পথ পরিক্রমার আহ্বান, কখনও মৃত্যর অব্যবহিত নৈকট্যের চোখবাঁধানো আলোকে জীবনের রহস্যভেদ ও পরিণতিতে এক শান্ত সমাপ্তির পরিতৃপ্ত পূর্ণতা - এইরূপ নানা ভাব দ্রুত আবর্তনে ও স্বতউদ্ভিন, লক্ষ্যহীন আবেগসংঘাতে কবি চিত্তকে মথিত করিয়াছে । কবি এই ভাবপরম্পরার ক্রমপর্যায়কে কোন কেন্দ্র পরিণতির দিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই, প্রত্যেকটির অভিঘাত স্বতন্ত্রভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন।তাঁর কল্পনা ঝটিকার প্রচন্ড ও বহুমুখী বেগকে ঠিক ধারণ করিতে পারে নাই। বেগের প্রতিঘাতে অন্তরের অনুভূতিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে।"

টিপ্পনী

৩.৬ বৈশাখ

নিসর্গ সাধারণ এক অনবদ্য প্রকাশ হল 'বৈশাখ'। যদিও রবীন্দ্র কাব্যকে কোন বিশেষ তত্ত্বে, বিশেষ নামে চিহ্নিত করা শক্ত, তবু কোন কোনটায় একটা বিশেষ ভাব,বিশেষ অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে - সেই মতো একটা একরৈখিক বিশ্লেষন করে আলোচনা করাহয়। সেদিক থেকে 'বৈশাখ'কে নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতা বলা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতনে বসে কবি কবিতাটি লেখেন ১৩০৬বঙ্গাব্দে । 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি সম্পর্কে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে কবি জানান -

"এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতরপ্তি বা আকাঙ্খার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতেরকবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার 'বৈশাখ' কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা বাহুল্য এটা শেষ জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে

টিপ্পনী

রচনাকালের সমস্ত কিছু। ..... বৈশাখ' কবিতার সঙ্গে মিশিয়া আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্রমাধ্যাহ্নের দিপ্তী। যেদিন লিখেছিলুম সেদিন চারিদিক থেকে বৈশাখের যে তপ্তরূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিনটিকে যদি ভুমিকা রূপে ঐদিনের সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরাতে পারতুম তা হলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না। তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নীচের দুটি লাইননিয়ে -

ছায়ামূর্তি যত অনুচর

দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে।

খোলা জানালায় বসে ওই ছায়ামুর্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেছি শুষ্ক-রিক্ত দিগন্ত - প্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে স্রোতের মতো হু হু করে ছুটে আসছে ঘূর্ণানৃত্যে, ধূলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি, পড়ে দেখো।

তারপরে এক জায়গায় আছে -

সকরুণ তব মন্ত্র সাথে

- এ দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছো।

"সেদিনকার বৈশাখ মধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল বলেই ওটা লিখতে পেরেছি। ধূধূ করছে মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, কাছে আমলকী গাছগুলোর ঝিলমিল করছে, ঝাড় উঠেছে নিশ্বসিত হয়ে, ঘু ঘু ডাকছে স্নিগ্ধসুরে - গাছের মর্মর,পাখিদের কাকলি দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙামাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থরগমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্তস্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে যে একটি বিশ্বব্যাপী করুণ সুর উঠতে থাকে, নিঃসঙ্গ বাতায়নে বসে সেটি শুনেছি, অনুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অনুচরির যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয়তো কী ? নৃত্যের ভঙ্গী দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছে, কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণি গতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাইনি। বৃহৎ ভুমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তর যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায় তার রূপ নয় তার গতিই অনুভব করি, তার শব্দ তো শুনিনে। এস্থলে আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার যো নেই। ইতি ৪ কার্তিক, ১৩৩৯।"

এ কবিতার বিষয়ে সমস্ত কথা কবি বলে দিয়েছেন। কাজেই আমাদের বিশেষ কিছু বলবার থাকে না। শুধু আনুপূর্বিক অনুষঙ্গগুলো নিয়ে আলোচনা করা

যেতে পারে। একটি বিশেষ দিনের তাৎক্ষনিক বহির্জগিক দৃশ্য এবং কবির নিজস্ব অনুভূতি, কল্পনা - এই দু'য়ে মিলে নির্মিত হয়েছে 'বৈশাখ' কবিতা।

পঞ্চাশটি ছত্রদশটি পাঁচধরণের স্তবকে কবি বৈশাখকে রুদ্ররুপে কল্পনা করেছেন। আবার তারই মধ্যে কল্যানময় মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তপৎক্লিষ্ট তপ্ত তনু নিয়ে, মুখে শিঙা নিয়ে রুদ্রের মতোই তার আবির্ভাব। এই বৈশাখের অনুচরদের তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার অনুভুতি দিয়ে । এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি।

এরপর তিনি বৈশাখীরুপ কে 'দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী' বলে সম্বোধন করেন। তার কারণ বৈশাখ' রুদ্ররূপে সব ধ্বংস করার পর একসময় তার তেজ কমে । তখন সে সন্ন্যাসির মতো হয়ে যায় - মনে আসে বৈরাগ্য । এখানেই রুদ্ররূপ ও স্নিগ্ধরূপ মিলে মিশে যায়।

এই দুই রুপ মিলে মানবমঙ্গলে নিয়োজিত হয়। কবি বলেন -

"হে বৈরাগী, করো শান্তি পাঠ
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।"

তারপরই কবি কালবৈশাখির কাছে প্রত্যাশা জানিয়েছেন, বৈশাখের রুদ্ররূপের কাছে আহ্বান জনিয়েছেন,দুঃখ দূর করার জন্য । মর্মভেদী সকল দুঃখ এবং গোটা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে দুঃখের বোঝা হাল্কা হোক।

শেষ পর্যায়ে বৈশাখের স্নিগ্ধমূর্তি অঙ্কিত হয় । বিশ্বের সকল মানুষ যে দুঃখের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ক্ষুধা -তৃষ্ণায় কাতর, চিনআব মগ্ন - তাদের প্রশান্তি দেওয়ার জন্য কবি বৈশাখের কাছে নিবেদন জানান -

"জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষ-কোটি নরনারি - হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতিগেরুয়া অঞ্চল।"

এখানেই কবিতা অন্য ব্যঞ্জনা বহন করে । মানব মঙ্গলের জন্য তিনি বৈশাখকে আহ্বান করেন। নিছক কল্পনার বিলাস নয়, মানবমঙ্গলের আন্তরিক আর্তি ধরা পড়ে কবির স্বরে।

কবিতাটির শেষস্তবকে আবার রুদ্র বৈশাখকে জাগ্রত হতে বলেন কবি। রুদ্র যেমন ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে নতুন সৃষ্টি বীজকে বপন করেন - এখানেও বৈশাখ তার ধ্বংসাত্মক সত্তা নিয়ে যেন আসে তাহলেই সকল মালিন্যের অবসান হবে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নতুন সম্ভাবনা দেখা দেবে।বৈশাখকে কবির রুদ্র কল্পনার সার্থকতা এখানেই। তাই আপার অর্থে রুদ্রের আগমনী গান হলেও বৈশাখের কল্যাণময় রুপটিও উপস্থিত। তাই নটরাজকে তিনি বলেন -

"ছাড়ো ডাক, এ রুদ্র বৈশাখ !
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণি শূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।"

শেষে এই নটরাজের প্রতীক্ষা। তার আগমন না ঘটলে দগ্ধ তৃণের বুকে নতুন জীবনের আশ্বাস জাগাবে না আর।

প্রশ্নাবলী

১। দুঃসময় কবিতাটি আসলে দুঃসময় মুক্তির কবিতা আলোচনা করো।

২। বর্ষামঙ্গল আসলে বর্ষা বন্দনার কবিতা আলোচনা করো।

৩। স্বপ্ন কবিতাটি পুরাণের নব ভাষ্য - ব্যাখ্যা করো।

৪। মদনভস্মের পর কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করো।

৫। বর্ষশেষ কবিতার ভাববস্তু লেখো।

৬। বৈশাখ কবিতার একদিকে আছে বৈশাখের রুদ্ররূপ অন্যদিকে আছে তার কল্যাণময় রূপ - আলোচনা করো।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

স্ব-সহায়ক সামগ্রী

১. কল্পনা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. আত্মপরিচয় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. রবীন্দ্র - সৃষ্টি- সমীক্ষা - শ্রী শ্রীকুমারবন্দ্যোপাধ্যায়
৪. রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়
৫. রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ - প্রমথ নাথ বিশী
৬. রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় - ক্ষুদিরাম দাস
৭. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩) - সুকুমার সেন

৮. রবীন্দ্রজীবনী - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

৯. কবি রবীন্দ্রনাথ - বুদ্ধদেব বসু

১০. রবিরশ্মি - চারিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১১. রবীন্দ্র রচনাভিধান (১) - অনুত্তম ভট্টাচার্য

১২. দর্পণে রবীন্দ্র কবিতা - ড. অশোক কুমার মিশ্র

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চতুর্থ একক

রাজর্ষি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টিপ্পনী

৪.১. ভুমিকা

৪.২. রচনাকাল

৪.৩. 'রাজর্ষি' রচনার প্রেক্ষাপট

৪.৪. রাজর্ষি : গোত্র নির্ণয়

৪.৫. রাজর্ষি : নামকরন

৪.৬ চরিত্র : ক. গোবিন্দমাণিক্য

খ. রঘুপতি

গ. নক্ষত্ররায়

ঘ. জয়সিংহ

ঙ. বিল্বন ঠাকুর

৪.১ ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্রাটের আসনে প্রতিষ্ঠিত, মুলত তা তাঁর উপন্যাসের কারণেই। প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসের স্রষ্ট্রা তিনিই।বঙ্কিমের কালেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস লেখার শুরু। সময়টা মোটামুটি উনিশ শতকের শেষ দিক। এরপর থেকে আমৃত্যু প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরা রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ছোট-বড় মিলিয়ে চৌদ্দটি উপন্যাস লেখেন। এই সৃষ্টির মধ্যে ধরা রয়েছে দেশ-কালের ছবি। কাব্য কবিতার ক্ষেত্রেও যেমন রবীন্দ্রনাথ ক্রমপরিণতিতে পৌঁছেছিলেন। উপন্যাসেও তাই। তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। যত সময় গেছে ততই রবীন্দ্রনাথ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। 'রাজর্ষি' রবীন্দ্রনাথের একেবারে গোড়ার দিকের উপন্যাস এ উপন্যাসে স্পষ্ট বঙ্কিমপ্রভাব বিদ্যমান নেই উপন্যাসটিই লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ সবে কুড়ি পেরোনো যুবক। তিনি যৌবনের বনে মন হারিয়েছেন। নিজেকে খুঁজছেন সবে। কাজেই তাঁর লেখার মধ্যে সে পরিচয়ই পাওয়া গেছে। অনেক ফাঁক - ফোঁকড়ও থেকে গেছে এ উপন্যাসে। সমালোচকরা সে বিষয়ে আলোকপাতও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও শুরুর দিকের এই

স্ব-সহায়ক সামগ্রী

লেখাগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ভাবেই পরবর্তী কালে মন্তব্য করেছে যে, সে সময় বিদ্যা, জীবনাভিজ্ঞতা - দুটোই কম ছিল , তাই লেখাগুলোর মধ্যে বস্তু কম ছিল, ভাবুকতাই ছিল বেশি। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের এ মন্তব্য থেকে স্পষ্ট রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে পরিণত হয়েছেন। স্বতন্ত্র হয়েছেন। তবে একথা ও ঠিক রবীন্দ্রনাথ যখন 'রাজর্ষি';লিখছেন তখন বঙ্কিমযুগের সম্মোহন থেকে মুক্তি পাওয়া একটু শক্ত। সদ্য যুবক রবীন্দ্রনাথও সে প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। আবার এও ঠিক 'রাজর্ষি' কিছু সম্ভাবনাকে জন্ম দিল। তা পরে আলোচিত হবে।

টিপ্পনী

৪.২ রচনাকাল

'রাজর্ষি' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ১২৯২ - ৯৩ সাল নাগাদ (ইং ১৮৮৫ -৮৬) জোড়াসাঁকোতে বসে রচনা করেন । এই উপন্যাসটি 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস থাকে মাঘ মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে সাতটি সংখ্যায় প্রথম খন্ডের আঠারোটি পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় খন্ডের ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় ।পরে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের পৌষে সমগ্র উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীকে উৎসর্গ করেন।

৪.৩ রাজর্ষি রচনার প্রেক্ষাপট

'রাজর্ষি উপন্যাসটির লেখার পেছনে একটি গল্প আছে । উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস : কেমন স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস ? জীবনস্মৃতিতে কবি তার উল্লেখ করে বলেছেন -

> "বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবউ ঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগন এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু, শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারেনা জানিয়া তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। দুই এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ন বাবুকে দেখিতে যাই । কলকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না - ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল।মনে করিলাম, ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরে সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'বাবা, একী ! এ যে রক্ত !" বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা

করিতেছে। -জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অণ্য লেখা আমার আরও আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতেলাগিলাম।"

এই স্বপ্নে পাওয়ার কথা কবি রচনাবলীতে অন্তর্গত করার সময়ও বলেছেন। সেখানে আরো কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। রবীন্দ্র রচনাবলী (১) র সুলভ সংস্করনে রাজর্ষির ভূমিকায় কবি বলেন -

"বালক পত্রের সম্পাদিকা আমাকে ঐ মাসিকের পাতে নিয়মিত পরিবেশনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফল হল এই যে, প্রায় একমাত্র আমিই হলুম তার ভোজের জোগানদার। একটু সময় পেলেই মনটা 'কি লিখি', 'কী লিখি' করতে থাকে।

রাজনারায়ন বাবু ছিলেন দেওঘরে। তাঁকে দেখতে যাব বলে বেরোনো গেল। রাত্রে গাড়ির আলোটা বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে বলে তার নিচেকার আবরনটা টেনে দিলুম। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সহযাত্রির মন তাতেপ্রসন্ন হল না, ঢাকা খুলে দিলেন। জাগা অনিবার্য ভেবে একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলুম। ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম - একটা পাথরের মন্দির। ছোট মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয় ! কী বেদনা ! বাপকে সে বার বার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন ! বাপ কোনমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম,গল্প পাওয়া গেল। এই স্বপ্নের বিবরণ 'জীবনস্মৃতি'তে পূর্বেই লিখেছি, পুনরুক্তি করতে হল। আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পুজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিকপত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায়না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বড়িয়ে চলতে হল।"

এমন একটি স্বপ্ন দেখার পেছনে হয়তো তাঁর শৈশবের স্মৃতিই দায়ী। তিনি একদিন (১৮৬৫তে) কলকাতার এক বড় কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে দেখেছিলেন রক্তের একটা স্রোত চৌকাঠের নিচে উপচে পড়ছে। এক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী লোক তার শিশুর কপালে সেই রক্তের তিলক দিয়ে দিচ্ছে। একজন পুরোহিত একটা বাচ্চা ছাগলের গলায় কোপ বসানোর আগে পা ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। এই ঘটনা টিকে বিশেষ নাড়া দিয়েছিল সেই অতি শৈশবে। এ কথা তিনি পরবর্তীকালে রোম্যাঁ রলাঁকে খুব আবেগপ্রবন ভাবে বলেছিলেন। রোম্যাঁ রলাঁ সেই কথা জেনেভার সাক্ষাৎকারের বিবরণে উল্লেখ করেছেন (২৮ আগষ্ট, ১৯৩০)। বোধ হয় শৈশবের সেই ঘটনাই স্বপ্ন হবে পরবর্তীতে কবি চিত্তে উদিত হয়েছে। এই ঘটনা এবং ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ঘটনা মিলিয়ে মিশিয়ে কবি লিখলেন 'রাজর্ষি' উপন্যাস।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৪.৪ রাজর্ষি : গোত্রনির্ণয়

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘রাজর্ষি’। হিন্দু ধর্মের পুজোর একটি আকার জীববলি। এই জীব-বলিকে কেন্দ্র করে সংস্কার মুক্ত রাজশক্তি ও ধর্মান্ধ, স্বার্থান্ধ, সংস্কারচ্ছন্ন পুরোহিত তন্ত্রের মধ্যে সংঘাতকে আশ্রয় করে রচিত এই ‘রাজর্ষি’। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে কবির ব্যাক্তিগত পরিচয় ছিল। এই রাজপরিবারের কাহিনী কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। তারই প্রতিফলন ঘটান তিনি উপন্যাসে।

কৈলাস সিংহের ‘ত্রিপুরার ইতিহাস’ প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করেন। এছাড়া ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের পাঠনো রাজ পরিবারের ইতিহাস, স্টুয়ার্টের বাংলার ইতিহাসও ‘রাজর্ষি’ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ছাব্বিশটি অধ্যায় পর্যন্ত লেখার পর বেশ কিছুদিন উপন্যাসটি আর লেখা হ’ল না, পড়ে রইল। এরপর উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র গোবিন্দমাণিক্য সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২৩শে বৈশাখ (৫মে, ১৮৮৬) বীরচন্দ্রমাণিক্য কে চিঠি লেখেন। তাতে কবি লেখেন -

> “মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে আমি ত্রিপুরা রাজ বংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া ‘রাজর্ষি’ নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারন, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমানিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিব। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্ব্বাসন দশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতে পাই, তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।”

[দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা (শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ), পৃ - ৩৯৫, জীবনস্মৃতি (১৩৬৮), গ্রন্থপরিচয়, পৃ - ২২০ -২১]

এই পত্রের বিষয়ানুযায়ী বীরচন্দ্রমাণিক্য কবিকে ‘রাজরত্নাকার’ নামে ত্রিপুরা রাজবংশের একটি ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাসের অন্তর্গত ‘মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যস্য চরিত্রম্’ অংশ পাঠান। এই ইতিহাসটা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর ষোড়শ দিনে শুভ তিথিযুক্ত বুধবারে যুবরাজ গোবিন্দনারায়ন নানারকম মহোৎসবসহ নিজের কুলাচার অনুসারে সিংহাসনে আরোহন করে পূর্বের রীতি অনুসারে একপিঠে শিবলিঙ্গ এবং অন্যপিঠে নিজের মহিষী গুনবতীর নাম অঙ্কিত করে সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা প্রথম প্রচার করলেন।তারপর অমাত্যবৃন্দ যথাবিধি রাজাকে উপহার দিলেন। রাজা ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকদের ভোজ্য ও

দানে খুশি করলেন। এতে বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্রঠাকুর ঈর্ষান্বিত হয়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁর পরিচয় জেনে তাঁকে সমাদর করে নিজের নগরে স্থান দিলেন । নক্ষত্রঠাকুর নানারকম কৌতুকবাক্যে প্রতিদিন নবাবকে আনন্দ দিলেন। ক্রমে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। নক্ষত্রঠাকুর নবাবকে জানান যে তার সাহায্যে যদি ত্রিপুরার পিতৃরাজ্য তিনি লাভ করতে পারেন তাহলে মুর্শিদাবাদের নবাবকে হাতি ইত্যাদি উপহার দেবেন। একথা শুনে নবাব ভাবলেন - আমি অনেকবার ত্রিপুরারাজ্য অধিকার করার চেষ্টা করেও জয়ী হইনি। এখন এদের মধ্যে আত্মকলহ বেধেছে। সুতরাং সহজেই সে রাজ্য লাভ করব। এই ভেবে তিনি মহাপরাক্রান্ত সৈনিকদের তাঁর সঙ্গে দিলেন এবং নিজের রাজ্য লাভের জন্য তাঁকে যুদ্ধ যাত্রা করতে বলেন। নক্ষত্রঠাকুর তাদের নিয়ে উদয়পুর রাজধানীর কাছাকাছি এলেন।একথা শুনে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী রাজাকে যুদ্ধের আয়োজন করতে বললেন। ধীর ও শান্ত রাজা তা শুনে ত্রিপুরা বাসীকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন - ক্ষনভঙ্গুর এই রাজ্যসুখ ভোগ করবার জন্য আমি কখনো ভাইয়ের সঙ্গে চিরকাল অকীর্তিকর যুদ্ধ করব না। এমন রাজ্যভোগের চাইতে বনে যাওয়া অনেক ভালো। তিনি রাণী গুনবতী ও অনান্য ভাইদের সঙ্গে রিয়াং দেশে গেলেন এবং সেখানে একটি নগর তৈরী করলেন।সেখানকার রিয়াংরা ত্রিপুরেশকে আত্মীয় স্বজনের মতো সম্মান করলেন। এরপর কিছুদিন ছত্রমাণিক্যের (নক্ষত্ররায়ের) রাজ্যাধিকার ছিল। তাঁর মৃত্যুতে গোবিন্দমাণিক্য পুনরায়রাজা হলেন।

এদিকে গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি রিয়াংরা ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হতে থাকল। তিনি তখন রাণী, ভাই জগদ্বন্ধুঠাকুর ও সূর্যনারায়ণ, প্রতাপনারায়ন, চম্পকনারায়ণ নামে ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিয়ে চট্টলদেশের দিকে রওনা হলেন। পথে জগদ্বন্ধু ঠাকুরের পুত্র রাজকুমার বাবার নিষেধ সত্ত্বেও স্বদেশে যেতে উপক্রম করল।তার ধৃষ্ট আচরনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জগদ্বন্ধু ঠাকুর তাঁর জামাতাকে পুত্রের শিরচ্ছেদ করে আনতে আদেশ দিলেন। তিনি কিছু দূরে রাজকুমারের কাছে পৌঁছে তাকে প্রতিনিবৃত করতে অনেক চেষ্টা করলেন। তারপর কঠোর বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাদমান দুজনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে জগন্নাথ রাজকুমারের শিরচ্ছেদ করে শ্বশুরের কাছে আনলেন । সেই ছিন্নমুন্ডু দেখে গোবিন্দমাণিক্য তীব্র ভৎর্সনা করলেন । তারপর মহারাজ চট্টল দেশে কিছুদিন থেকে রসাং প্রদেশে গেলেন। আরাকানের অধিপতি নিজের দেশে বন্ধু গোবিন্দমাণিক্যের আগমন বার্তা শুনে অতিশীঘ্র তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বন্ধু জনোচিত সৌজন্য দেখিয়ে তাঁকে রাজধানীতে এনে সুখে বসবাস করতে স্থান দিলেন। তারপর ১০৭১ ত্রিপুরাব্দে দিল্লীশ্বরের দ্বিতীয়পুত্র সুলতান সুজা নিজের ভাই ঔরংজীবের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন এবং রসাং প্রদেশে এসে উপস্থিত হলেন। একদিন গোবিন্দ্যমাণিক্যের সঙ্গে আরাকান অধিপতি যখন সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন দিল্লীশ্বর পুত্র সুজা সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। রসাংরাজ এই লোকটি যবন এই ভেবে তাচ্ছিল্য বশত তারপ্রতি কোনো সম্মান না দেখিয়ে চুপ করে রইলেন। তখন গোবিন্দমাণিক্য সসম্ভ্রমে উঠে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং অনিচ্ছুক রসাংরাজকে অনুরোধ করে সুজাকে বহুমূল্য আসন প্রদান করলেন। তারপর যথাসময়ে সকলে উঠে নিজের নিজের জায়গায় যেতে উদ্যত হলেন। তখন সুলতান সুজা গোবিন্দমাণিক্যের হাত ধরে বললেন রাজা, আপনি আমাকে যে আজ এত সম্মান দান করলেন তা আমি আমরন বিস্মৃত হব না ; এখন প্রিয়জনের এই উপহার গ্রহণ করুণ - এই বলে তাঁকে মহামূল্য হিরের আংটি দিলেন। ত্রিপুরেশ্বর বারবার অনুরুদ্ধ হয়ে তা গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পরে সুলতান সুজা আরাকান -আধিপতির কণ্যাকে বিয়ে করে তাঁর রাজধানীতে পরম সুখে বাস করলেন। কিন্তু দুষ্টুমতি মনে মনে ভাবলেন ; যদি আমি শ্বশুরকে হত্যা করতে পারি, তাহলে এসকল রাজ্য আমার অধিকারে আসবে । এই ভেবে তিনি চল্লিশজন যোদ্ধাকে সংগ্রহ করলেন। এরপর একদিন রাজকুমারী পিত্রালয়ে যাবেন এই ছলনায় অনেকগুলি পালকি সংগ্রহ করে তার প্রত্যেকটিতে দুজন করে যোদ্ধা রেখে রওণা হলেন। তারপর যখন তারা ষষ্ঠদ্বার অতিক্রম করে সপ্তমদ্বারে প্রবেশ করতে উদ্যত হল, তখন এক বৃদ্ধ প্রহরী অনেকগুলি পালকি দেখে সন্দেহ করে এবং পালকি বাহকদের নিবৃত্ত করে একটি পালকির দরজা খুলে দুজন যোদ্ধাকে দেখতে পেল। তকন সবগুলি পালকি থেকে সশস্ত্র যোদ্ধারা বেরিয়ে এসে প্রহরীদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করল। কোলাহল শুনে চারিদিক থেকে রাজসৈন্যরা এসে সেই যোদ্ধাদের হত্যা করল। একথা শুনে সুলতান সুজা ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে গেলেন। আরাকন রাজ কপটচারী সুজার এরুপ আচরন দেখে তাকে হত্যা করবার জন্য সঙ্কল্প করলেন কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না । তারপর ১০৭৫ ত্রিপুরাব্দে আরাকান রাজ ধাতুনির্মিত বহুমূল্যবান দৈবসিংহাসন এবং বহুরকম তৈজস উপহার দিবে গোবিন্দমাণিক্যকে স্বদেশে পাঠালেন। ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্য অরাজক হয়ে উঠেছিল এবং শত্রুভয়ে উৎপীড়িত ত্রিপুরাবাসী পাত্রমিত্র প্রভৃতি চট্টগ্রাম থেকে গোবিন্দ মাণিক্যের আগমনবার্তা শুনে আনন্দিত মনে বিশেষজ্ঞ রাজ্যভার গ্রহণ করতে অণুরোধ করলেন। রাজা তাঁদের প্রার্থনায় নিজের রাজধানীতে এসে সেই বছর আশ্বিন মাসে শুভক্ষনে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসেন। এরপর দিল্লীশ্বর ঔরংজেব তাঁর ভাই সুলতান সুজা গোপনে ত্রিপুরা অবস্থান করেছেন জেনে তাঁকে বন্দী করে নিজের কাছে পাঠাবার জন্য ত্রিপুরাধিপতির কাছে দুত পাঠালেন। তখন সেই ভিরু রাজা মুঘলের উপদ্রব ভয়ে পাঁচটি হাতি উপঢৌকন স্বরূপ মুঘল সম্রাটের কাছে পাঠালেন। এর আগে কোনো ত্রিপুরাই এই পথ অনুসরণ করেননি। গোবিন্দমাণিক্যই সর্বপ্রথম এই আচরণ করলেন, তারপর তিনি চন্দ্রশেখরে একটি মন্দির নির্মাণ করে সেই দেবতার প্রীতির জন্য উৎসগ্র করলেন। সেখানে গোবিন্দসাগর এবং অন্যত্রও বহু পুষ্করিনী উৎসর্গীকৃত হয়েছিল । তারপর তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে কাঞ্চনতুলা পুরুষদান অনুষ্ঠান করলেন এবং তাম্রফলকে লেখা সনন্দের দ্বারা বহু ব্রাহ্মণকে জমিদান করলেন।রাণী গূনবতী নুরনগর প্রদেশে গুণসাগর নামে সরোবর প্রতিষ্ঠা করলেন। বর্ষাকালে গোমতী নদীর বন্যা নিবারণের জন্য সেতু নির্মাণ করে জলস্রোত থামালেন । তখন থেকেই গোমতীর তীরে বহুজন বহু বাসস্থান নির্মাণ করেছে । সুলতান সুজা গোবিন্দমাণিক্যকে যে হিরের আংটি দিয়েছিলেন তার মূল্য দিয়ে তিনি

পাকা-সুজা মসজিদ নির্মান করলেন এবং সুজাগঞ্জ নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করলেন । পূর্বে আরাকানরাজ, চন্দ্রশেখরের যে সমস্ত পূজা-অর্চানাদি বিলুপ্ত করেছিলেন, গোবিন্দমাণিক্য নিজ ব্যায়ে সেগুলি সবই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকে ।ঐতিহাসিক উপন্যাসের মানদন্ড কি ? প্রথম শর্তই হল কাহিনী হবে ইতিহাস নির্ভর। অর্থাৎ মূল ভিত্তি থাকবে ইতিহাস নির্ভর কিছু সত্য ঘটনা। লেখক কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কিছু কাল্পনিক চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টি করতেই পারেন। তবে তার মধ্যে অবশ্যই ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য থাকবে। অর্থাৎ কোন ভাবেই তাতে কালানৌচিত্ত্য দোষ ঘটবে না। লেখক কোন একটি উদ্দেশ্য সফল করতে তিনি বেছে নেনে কোন ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনাকে । অনৈতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনাও থাকতে পারেঐতিহাসিক উপন্যাসে । কিন্তু তা যেন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে খাপ খেয়ে যায়। ইতিহাসকে লেখক বিকৃত করবেন না কখনোই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে । এই শর্তগুলো যে উপন্যাস পালন করে তা ঐতিহাসিক উপন্যাসের গোত্রের মধ্যে পড়ে।

'রাজর্ষি' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবেন এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে বসেননি। বরং একটি স্বপ্নের ঘটনাকে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি 'রাজর্ষির' পরিকল্পনা করেন । উপন্যাসের ছাব্বিশটি অধ্যায় লেখার পর রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের খোঁজ করেন ত্রিপুরার রাজার কাছে সেখান থেকে যে ইতিহাস পান তিনি তার প্রায় অবিকৃত রূপ দেন উপন্যাসে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের দুটি ভাবনা ক্রম। প্রথম ছাব্বিশ অধ্যায় পর্যন্ত অনৈতিকহাসিকরূপ। দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ ছাব্বিশ অধ্যায় পরবর্তী থেকে শেষ অধ্যায় অর্থাৎ চুয়াল্লিশ অধ্যায় উপসংহার পর্যন্ত ঐতিহাসিক ভাবনা দ্বারা পুষ্ট। এছাড়া আরো একটি কথা এখানে বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে এবিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তা হল -

> "আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রাজর্ষি নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথের একথার সূত্র ধরে বলা যায়, তিনি পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা এ সময় যদিও প্রভাবিত হয়েছিলেন তথাপি তাঁর প্রস্তুতি কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রস্তুতি ছিল না । কাজেই বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার আগ্রহে 'রাজর্ষি' লেখেননি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' সম্বন্ধে আরো বলেন যে 'আসল গল্পটি ছিল প্রেমের অহিংস পুজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ'। তাই রাজর্ষিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাচ্ছে না। উপন্যাস হিসেবেও ত্রুটিযুক্ত । দ্বিতীয়ার্ধে ইতিহাসের কাহিনী থাকলেও তা উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেননি। প্রথম পনেরটি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এর কাহিনীর মধ্যে ঐক্যছিল। কিন্তু তারপরই কাহিনী নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে জটিল হয়ে পড়ে। এই জটিলতার ফলে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন ও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হয়ে উঠেছে। একবিংশ থেকে চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত

টিপ্পনী

বিজয়গড়ের খুড়াসাহেবকে নিয়ে একটি এবং পঞ্চবিংশ ষড়বিংশ পরিচ্ছেদের গুজুরপাড়া গ্রামকে কেন্দ্র করে আর একটি গল্প তারই প্রমাণ। এগুলো মূল উপন্যাসের সঙ্গে একই ভাবরস রক্ষা করতে পারেনি।

যাইহোক 'রাজর্ষি' ইতিহাস নির্ভর একটি উপন্যাস। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। 'রাজর্ষি' শিশুদের জন্য লেখা তাহলে? শিশুসাহিত্য? তাও বোধহয় নয়। এর ভাষা, রচনাভঙ্গী ও বিষয়ের দিকে নজর দিলে দেখা যায় তা শিশু চিত্ত বিনোদন মূলক রচনা নয়। এ উপন্যাসে দুটি শিশু চরিত্র রয়েছে হাসি ও তাতা। হাসি আগেই মারাযায়। তাতা উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত আছে। কিন্তু তার ভূমিকা নিতান্তই সরলরৈখিক। বরং হাসি উপন্যাসের একটি উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছিল। তবে সমগ্র উপন্যাসটি শিশু পাঠকের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠেনি।

বরং সমগ্র দিক বিচার করে একথাই বলা যায় 'রাজর্ষি' রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেরচিত উপন্যাস। যার প্রথম অংশটি ইতিহাস নিভর নয়, দ্বিতীয় অংশটি প্রায় নির্ভুল ইতিহাসের অনুবর্তন।

টিপ্পনী

৪.৫ নামকরণ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ সবসময়ই গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয়। কেননা নামকরণ হল প্রাথমিক ভাবে পাঠকের সাথে সম্বন্ধের প্রথম ধাপ। নাম দিয়ে সবটা চেনা না গেলেও পাঠক প্রাথমিক ভাবে একটা অনুভূতিতে আক্রান্ত হন নামের কারণে যে নামকরণটির কিছুই বোঝা যায়না পাঠ করবার আগে আরও একটা গুরুত্ব আছে সাহিত্যের দরবারে। সেই নামটি প্রাথমিক একটা কৌতুহলতো তেরী করে। সাহিত্যে নামকরণ নানা দিক মাথায় রেখে করা হয় - ঘটনা, চরিত্র, বিষয় কিম্বা ব্যঞ্জনা এই সবদিকের কোন না কোন একটিকে সামনে রেখে নামকরণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার নামকরণ নিয়ে বরাবরই খুব ভেবেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পছন্দসই কোন নাম না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি তা বারেবারে বদল করেছেন। কাজেই নামকরণ সাহিত্যের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক তা রবীন্দ্রসাহিত্যের খোঁজ নিলে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নামকরণ মোটামুটি একটি সহজ ভাবনা থেকেই করেছেন। কোন গভীর ব্যঞ্জনা তার মধ্যে নেই। আবার সরাসরি কোন চরিত্রের নাম দিয়েও তা হয়নি। বরং চরিত্রের গুণাবলীই হয়ে উঠেছে নামকরণের পেছনের ভাবনা। একজন ব্যাক্তি তাঁর রাজার সত্তা ও ঋষির সত্তা মিলে যে দিক প্রকাশ পেয়েছে তাই-ই উপন্যাসের বর্ণিতব্য বিষয়। আমাদের এই উপন্যাসটি বিশ্লেষন করে খোঁজার চেষ্টা করতে হবে যে এই নামকরন কতটা শিল্পগুণান্বিত হয়েছে। নাম দিয়ে সত্যিই সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা। গেলে তা কিভাবে, কোন দৃষ্টি কোন থেকে তাকে আমরা বুঝবো।

'রাজর্ষি'র মূল প্লটের গঠন একটু দেখে নেওয়া যাক। কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে বর্ণনা করতে পারি এভাবে।

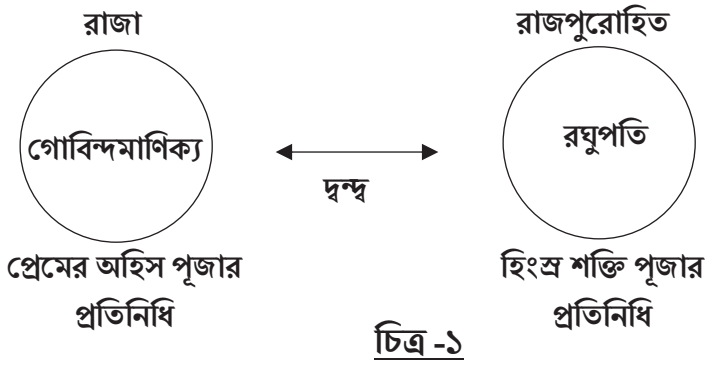

চিত্র -১

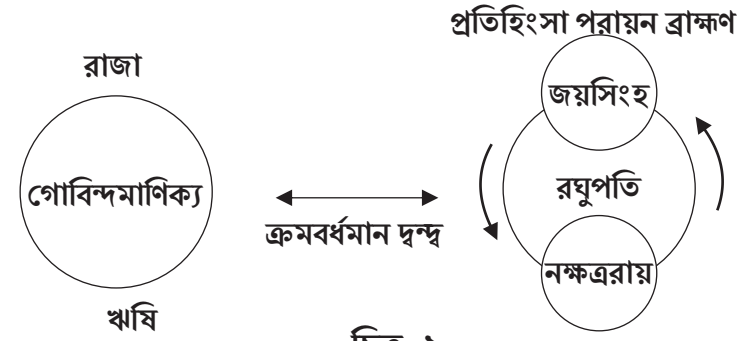

চিত্র -২

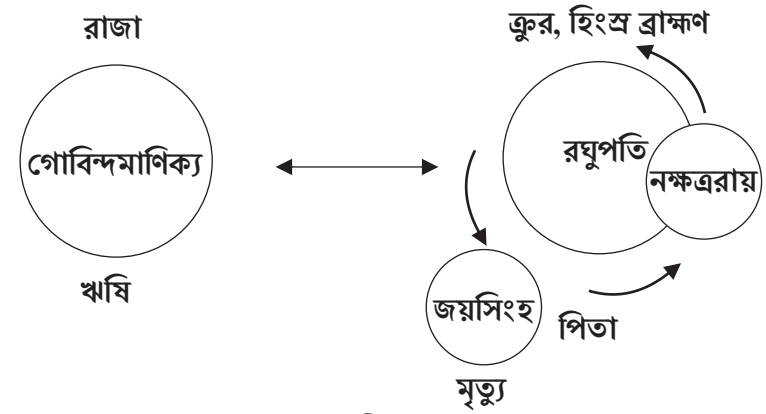

চিত্র -৩

চিত্র -৪

টিপ্পনী

উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় রাজা গোবিন্দমাণিক্যের আবির্ভাব । গোমতী নদীর তীরে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সামনে দেখা হয় দুই ভাই -বোন হাসি ও তাতার সঙ্গে। তারপর থেকে হাসি ও তাতা রাজার অন্তরের ধন। একদিন আষাঢ় মাসের সকালে হাসি মন্দিরের সামনে প্রচুর রক্ত দেখে ভয়ে সংকোচে বলে 'এত রক্ত কেন!' হাসির কাতরস্বরের এই প্রশ্নটি রাজাকে অস্থির করে তুলেছিল। রাজা তারপরেই তার রাজ্যে বলি বন্ধের নির্দেশ দেন । এখান থেকেই শুরু রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও রাজপুরোহিত (চোন্তাই) রঘুপতির মধ্যে বিরোধ। রাজা বলি বন্ধের নির্দেশ দিলে রঘুপতি তা মোটেও ভালোভাবে দেখেননি। উল্টে রাজার সঙ্গে তর্ক করেছেন। কোন প্রকারেই যখন গোবিন্দমাণিক্য তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করেননি, তখন রীতিমতো রাজাকে কড়া বার্তা দিয়েছেন -

"তুমি রাজা, তুমি ইচ্ছা করিলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করিতে পারো, তাই বলিয়া তুমি মায়ের বলিহরণ করিবে! বটে ! কী তোমার সাধ্য ! আমি রঘুপতি মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পূজার ব্যাঘাত কর দেখিব।"

এতো আবহমান কাল ধরে চলে আসা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের হুংকার রঘুপতির মুখে ! রাষ্ট্রপ্রধানও একজন পুরোহিতের রোষে পড়েন। এই শুরু হল গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে রঘুপতির প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব এক পক্ষের দ্বন্দ্ব। গোবিন্দমাণিক্য এ দ্বন্দ্বকে ত্বারানিত করেন নি। খুব সক্রিয় ও হন নি। যা কিছু করেছেন - সবই রঘুপতি। রাজার বিরুদ্ধে যত রকম হীন ষড়যন্ত্র করা যায় তার সবকটিই তিনি প্রয়োগ করেছেন। প্রথমেই তিনি গৃহবিবাদ বাধানোর চেষ্টা করেন। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে মন্ত্রণা দেন এই বলে যে নক্ষত্ররায় রাজা হবে। এই চক্রান্তে তিনি সুকৌশলে ধর্মীয় কুসংস্কারকে কাজে লাগান। তিনি নক্ষত্ররায়কে বলেন যে দেবী মা রাজরক্ত দেখতে চান। আর সেই কাজটি নক্ষত্ররায়কেই করতে হবে। রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে নির্দেশ দেন -

"তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনিতে হইবে।"

কিন্তু যে নক্ষত্ররায়কে নিয়ে রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন সেই নক্ষত্ররায় যে ভীরু, কাপুরুষ, মেরুদন্ডহীন । এদিকে জয়সিংহ রঘুপতির ষড়যন্ত্রের কথা শুনে তার মনে দ্বিধা জাগে। তার কি করনীয় সে বুঝে উঠতে পারে না।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
78

এরপর একদিন দেখা যায় দেবীমূর্তির মুখ উল্টে দিকে। সাধারণ প্রজাদের ধর্মীয় আবেগ দিয়ে রাজার বিরুদ্ধে ক্ষিপিয়ে তোলার এ এক জঘন্য কৌশল গ্রহণ করেন রঘুপতি। এমনকি জয়সিংহকে পর্যন্ত ছলনা করেন দেবমূর্তির আড়াল থেকে দৈববাণী করে।

শিশু অপহরণ করে খুন (বলি) করার মতো নীচ ষড়যন্ত্রের মুল হোতাও রঘুপতি।নক্ষত্ররায়কে দিয়ে তাতা বা ধ্রুবকে মন্দিরে আনানো হয়। তারপর দুজনে মদ্যপান করে। এরপর ধ্রুবকে বলি দেওয়া হবে। ধ্রুবকে বলি দেওয়ার পেছনের মূল

পাণ হল জয়সিংহ আত্মহত্যা করা পর রঘুপতি যে সন্তান হারানোর যন্ত্রনা পায়, সেই একই যন্ত্রনা সে গোবিন্দমাণিক্যকে দিতে চায় । রঘুপতির বিশ্বাস যে জয়সিংহের মৃত্যুর জন্য গোবিন্দমাণিক্য দায়ী । শেষ পর্যন্ত ধ্রুবকে বলি দিতে পারে না । তার আগেই গোবিন্দমাণিক্য খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে। এই অপরাধে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের আটবছর নির্বাসন হয় । এখানে গোবিন্দমাণিক্য রাজা । প্রকৃত রাজা যে রাজধর্ম পালন করেন । গোবিন্দমাণিক্য রাজা । গোবিন্দমাণিক্য এখানে নিজের ভাইকে পর্যন্ত শাস্তি দিয়েছেন । নক্ষত্ররায় রাজার পা জড়িয়ে ধরে মার্জনা ভিক্ষা করলে গোবিন্দমাণিক্য প্রকৃত রাজার সত্তার দ্বারা চালিত হয়ে বলেন -

"নক্ষত্ররায়, ওঠো, আমার কথা শোনো । আমি মার্জনা করিবার কে? আমি আপনার শাসনে আপনি বদ্ধ । বন্দীও যেমন বদ্ধ, বিচারকও তেমনি বদ্ধ। একই অপরাধে আমি একজনকে দন্ড দিব, একজনকে মার্জনা করিব, এ কী করিয়া হয় ? তুমিই বিচার করো।"

সভাসদরা পর্যন্ত নক্ষত্ররায়কে মার্জনার আর্জি জানায় রাজার কাছে তাতেও রাজা বিগলিত হননি । বরং নিজের ভাবনায় অটল । লক্ষ্যে স্থির শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্ত জানান তিনি -

"তোমরা সকলেই শুনিয়াছ-আমার রাজ্যের নিয়ম এই যে, যে ব্যাক্তি দেবতার উদ্দেশে জীব - বলি দিবে বা দিতে উদ্যাত হইবে তাহার নির্বাসনদন্ড। কাল সন্ধ্যাকালে নক্ষত্ররায় পুরোহিতের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বলির মানসে একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলেন । এই অপরাধ সপ্রমান হওয়াতে আমি তাঁহার আট বৎসর নির্বাসনদন্ড বিধান করিলাম।"

এই হল রাজা ; আদর্শ রাজা । রাজধর্ম যে সকল ব্যাক্তি সম্পর্কের উর্ধ্বে তা গোবিন্দমাণিক্য করে দেখালেন। তাই বলে তাঁর মধ্যে কি মাণবিক গুনাগুণ ছিল না। ভীষন ভাবেই ছিল। ভাইকে এ নির্বাসন দন্ড দেওয়ার পর তা রাজার মনে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছিলেন। দরজা বন্ধ করে বসে পড়লেন রাজা। তিনি রাজা, তিনি সমস্ত মানবিক আবেগ অনুভুতিপ্রবণ। কিন্তু কর্তব্য পরায়ন।

এরপর রঘুপতি ভাগ্যন্বেষনে বেরোন । নানা পরিস্থিতি মোকাবিলা করে মোঘলদের কাছে সৈন্য সংগ্রহ করে নক্ষত্ররায়কে নিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন বলে ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হন। এ খবর রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কানে গেলে তিনি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন ভাই নক্ষত্ররায়ের সঙ্গে । গোবিন্দমাণিক্যের নতুন রাজপুরোহিত বিদ্ধিমান সৎ বিল্বন কিছু সৈন্য জোগার করলেও গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধে রাজী নন । রঘুপতি এদিকে নক্ষত্ররায়কে আগলে রাখলেন । যাতে কোন দুর্বলতা তাকে চেপে না বসে । এদিকে গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে এক ঋষিসুলভ আধ্যাত্মিক চেতনা প্রকাশ পেতে শুরু করে।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য ভাইয়ে - ভাইয়ে যুদ্ধ কিছুতেই চাননি । রক্তপাত

টিপ্পনী

চাননি। তাই তিনি বনে চলে যাবেন মনস্থির করলেন। ধ্রুবকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ধ্রুবর কাকা কেদারেশ্বর তাঁকে অনুমতি না দেওয়ায় রাজা একাই বনবাসে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন। যাওয়ার সময় কি দারুন অপমান তাকে সহ্য করতে হল। মহারাজের অপমান সহ্য করতে না পেরে এক প্রজা নয়নরায় রাজাকে তরবারি উষ্ণীষ দিয়ে অবাধ্য প্রজাদের উচিত শিক্ষা দিতে বলেন। রাজা তখন বলেন -

"আমি এখন ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর অপমান সহ্য করিতে পারি। মুক্ত তরবারি তুলিয়া আমি এ পৃথিবীতে লোকের নিকট হইতে আর সম্মান আদায় করিতে চাহি না। পৃথিবীর সর্বসাধারণে যেরূপ সুসময়ে দুঃসময়ে মান - অপমান সুখ-দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে, আমিও জগদীশ্বরের মুখ চাহিয়া সেইরূপ সহ্য করিব।"

টিপ্পনী

এ এক ঋষি এসে মিলেছে সত্যনিষ্ঠ রাজার সাথে।

এদিকে গোবিন্দমাণিক্য সকল ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ত্যাগ করে চলে আসেন চট্টগ্রামে। আরাকানপতি তাঁকে রাজসভার পূজনীয় অতিথি করে রাখতে চান। রাজা সে সুখ ভোগ চান না। তিনি চট্টগ্রামের একপাশে বসবাস করতে চান। তারপর ময়ানি নদীর ধারে রাজা কুটির বাঁধেন। এখানে তাঁর মন প্রশান্ত হয়। এক উষ্ণতর চেতনা তাকে ঘিরে রাখে। আর তারই বশবর্তী হয়ে তিনি বলেন -

"আমিও আমার এই বিজনে সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব।"

বেরিয়ে পড়লেন নতুন কোথাও। তিনি নিজেকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে কষ্টকে জয় করলেন। বাসনা জয় করলেন। মানুষের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত হলেন। রীতিমতো সন্ন্যাসীর বেশে তিনি দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। মানুষকে নিজের সাধ্যমত দান করলেন। এরপর তিনি আরাকান অধিকৃত এক স্থানে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে 'ছেলেপিলে'দের নিয়ে পাঠশালা খুললেন। গোবিন্দমাণিক্য ধৈর্য ধরে মানুষ গড়তে লাগলেন। এহেন গোবিন্দমাণিক্য সম্পর্কে ফকির ছদ্মবেশ ধারী সুজার মনে হয়েছে -

"তিনি কিছুই চান না বলিয়াই যেন পাইয়াছেন - তিনি আপনাকে দিয়াছেন বলিয়াই পাইয়াছেন। তিনি যেমন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তেমনি সমস্ত জগৎ আপন ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে ধরা দিয়াছে। কোনো প্রকার আড়ম্বর নাই বলিয়া তিনি রাজা, এবং সমস্ত সংসারের নিতান্ত নিকটবর্তী হইয়াছেন বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী। এইজন্য তাঁহাকে রাজাও সাজিতে হয় নাই, সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।"

স্ব-সহায়ক সামগ্রী

এরপর হঠাৎই রাজার কাছে এসে রঘুপতি নিজেকে সমর্পণ করেন। মহারাজ তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। বিল্বন ধ্রুবকে নিয়ে হাজির হন রাজার কাচে রাজা সবই ফিরে পান। এদিকে নক্ষত্ররায় মারা গেলে আবার

গোবিন্দমাণিক্যকে সবাই রাজসিংহাসনে বসতে বলেন। তিনি সকলের অনুরোধে, ত্রিপুরার থেকে আগত দূতের বার্তায় গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে বসেন।

আমাদের দেখানোর বিষয় ছিল গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে একদিকে যেমন রাজার ধর্ম ছিল তেমনি আবার নিরাসক্ত সন্ন্যাসির কল্যানময় দিকটিও ছিল। ফলে তাঁর প্রেমের অহিংস ধর্মের কাছে একে একে পরাজিত হয়েছে হিংসাশ্রয়ী স্বার্থপরতা, ক্রুরতা। কাজেই সকলেই তার ভুল বুঝতে পেরে এ একে রাজর্ষির কাছে আশ্রয় পেতে চাইলেই। রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য নিয়ে উপন্যাসটি লেখেন তা 'রাজর্ষি' হওয়াই সঙ্গত। যথাযথ অহিংসা, ত্যাগ, অপৌত্তলিকতা, মানপ্রেম, সেবা এ সবই যার মধ্যে আছে তিনিই রাজা, তিনিই ঋষি। সেদিক থেকে গোবিন্দমাণিক্যকে রাজর্ষি বলা একদম সঠিক। উপন্যাসকেও।

টিপ্পনী

৪.৬ চরিত্র

গোবিন্দমাণিক্য :

ত্রিপুরার রাজা। তিনি এই 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রাণ ভ্রমরা নায়ক। তিনি রাজর্ষি। উপন্যাসে তাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তিনি নিঃসন্তান। অবশ্য তাঁর পরিবার সম্পর্কেও বিশেষ বিস্তারিত কিছু ঔপন্যাসিক জানান নি। তবে এটুকু বোঝা যায় তাঁর স্থান না থাকার কারণে তাঁর সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়েছে হাসি ও তাতার উপর। এমনকি তাঁর ভাই নক্ষত্ররায়ের উপরও। এই গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের বেশ কিছু দিক ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। সেগুলি হ'ল -

(ক) সন্তান বাৎসল্য

(খ) ভ্রাতৃপ্রেম

(গ) মানবপ্রেম

(ঘ) নির্লোভ মানসিকতা

(ঙ) কূটনৈতিক বুদ্ধিদীপ্ততা

তাঁর চরিত্রে এই দিকগুলি আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করো এবার।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
81

(ক) সন্তান বাৎসল্য :

গোবিন্দমাণিক্য নিসঃন্তান। কাজেই তাঁর মধ্যে শিশুদের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষন কাজ করবে তা তো স্বাভাবিক। তবে সমগ্র উপন্যাসে তাঁকে যে ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে তিনি নিঃসন্তান না হলেও তাঁর এই মানব ধর্মটির প্রকাশ ঘটত। যাইহোক, উপন্যাসের শুরুতেই গোমতী নদীর তীরে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের

টিপ্পনী

সামনে দুই বালক-বালিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গোবিন্দমাণিক্যের। বালকটির নাম তাতা। তার কথাও এখনো স্পষ্ট হয় নি। মন্দিরকে সে বলে 'লদন্দ' কড়াইকে বলে 'বলাই'। এতটাই ছোট সে। তার দিদি হাসি। সেও ছোট, এদের প্রতি মহারাজের কেমন একটা মায়া পড়ে গেল। যেদিন থেকে তাদের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হয়েছে তারপর থেকেই তারা রাজার পরমাত্মীয় যেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "তাহার পরদিন হইতে ঘুম ভাঙিলে সুর্য উঠিলেও রাজার প্রভাত হইত না, ছোটো দুটি ভাইবোনের মুখ দেখিলে তবে তাঁহার প্রভাত হইত। প্রতিদিন তাহাদিগকে ফুল তুলিয়া দিয়া তবে তিনি স্নান করিতেন ; দুই ভাইবোন ঘাটে বসিয়া তাঁহার স্নান দেখিত। যেদিন সকালে এই দুটি ছেলেমেয়ে না আসিত, সেদিন তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক যেন সম্পূর্ণ হইত না।"

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে রাজার স্নেহ গিয়ে পড়েছে এই দুটি ছেলেমেয়ের ওপর। এ স্নেহ বিশুদ্ধসন্তান বাৎসল্য তা ক্রমে ক্রমে আরো স্পষ্ট হয়েছে।

এরপর একদিন মন্দিরে একশো মোষ বলি হওয়ায় তার প্রচুর রক্ত দেখে হাসি রাজাকে প্রশ্ন করেছিল 'এত রক্ত কেন !' হাসির এ কাতর প্রশ্ন রাজার মনকে নাড়া দিয়েছিল গভীর ভাবে। তারপরই তিনি তাঁর রাজ্যে বলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এও তো সেই স্নেহ পরবশ হয়েই। হাসি ও তাতাকে রাজা এরপর থেকে চোখে হারাণ। একদিন হাসি ও তাতা আসেনি। স্বয়ং রাজা তাদের বাড়ি চলে যান। তরা অনুচরেরা বিস্মিত হয় এ ঘটনায়। রাজা এসে দেখলেন হাসির জ্বর। রাজবৈদ্য এসে সন্দেহ প্রকাশ করল হাসির শারীরিক অবস্থা দেখে। রাজা আবার সন্ধ্যাবেলাতেও এলেন হাসিকে দেখতে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজার কোলে হাসির মৃত্যু হ'ল। মাত্র ক'দিনের পরিচয়ে স্বয়ং রাজা হাসিকে দেখতে আসেন, তাঁর খোঁজ নেনে এবং রাজা অসুস্থ হাসিকে নিয়ে আগলে বসে থাকেন। যদিও শেষ পর্যন্ত হাসিকে বাঁচানো যায় নি। কিন্তু রাজা পরম মমতায় হাসিকে কোলে নিয়ে নিজে শুশ্রুষা করেন। হাসির বাবা - মা কেউ ছিল না। রাজাই তার পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। হাসির মৃত্যুর পর রাজার সকল স্নেহ ভালোবাসা গিয়ে পড়ে তাতার ওপর। তাতাকে রাজা নিজের কাছে রাখেন। পালক পিতা হিসেবে রাজা তাতা তথা ধ্রুবর যত্ন নেন। ধ্রুবও তার বাবা-মা না থাকার কোন যন্ত্রনাই বোঝে না রাজাকে স্নেহ পেয়ে। তার সঙ্গে রাজা খেলে, রাজমুকুট মাথায় দেয় ধ্রুব, রাজাকে শাসন করে সে। তার সমস্ত আজ্ঞা রাজা মেনে চলেন। লেখকের একটি কথাতেই বোঝা যায় ধ্রুবর প্রতি তাঁর কতটা যত্ন, স্নেহ, মমতা -

> "রাজাকে প্রায় তিনি 'পুতুল দেব' বলিয়া পরমপ্রলোভন ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন, এবং রাজা যদি কোনোপ্রকার দুষ্টুমির লক্ষণ প্রকাশ করেন তবে ধ্রুব তাঁকে 'গর বন্দ করে রাখব' বলিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত করিয়া তুলেন। এইরূপে রাজা এখন বিশেষ শাসনে আছেন - ধ্রুবের অনভিমত কোন কাজ

করিতে তিনি বড়ো একটা ভরসা করেন না।"

এই বর্ণনাই প্রমাণ করে ধ্রুবের প্রতি রাজার সন্তান বাৎসল্য কি প্রবল ছিল।

(খ) ভ্রাতৃপ্রেম :

রজা গোবিন্দমাণিক্যের ভাই নক্ষত্ররায়ের প্রতি রাজার স্নেহের কোন ঘাটতি চিল না। সবসময় রাজা ভাইকে আগলে রেখেছে। যখন ভাই তা বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে তখনো রাজা ভাইয়ের প্রতি স্নেহময়। আমরা উপন্যাসের শুরুতে দেখি -

"ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য একদিন গ্রীষ্মকালের প্রভাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার ভাই নক্ষত্ররায়ও আসিয়াছেন।"

ভাইকে নিয়ে রাজা সকাল বেলা স্নান করতে এসেছেন। তাতে বোঝা যায় রাজার সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক মধুর। এই নক্ষত্ররায় দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। তার নিজস্ব ভাবনা - চিন্তা করার ক্ষমতা বিশেষ ছিল না। তাই রঘুপতি যখন তাকে দাদার বিরুদ্ধে ক্ষপিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন তখন সে ভাইকে রঘুপতির হাত থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রঘুপতির চক্রান্তে সে শিশু হরনের মতো ভুল করে বসে। তখন রাজা রঘুপতির সঙ্গে সঙ্গে ভাই নক্ষত্ররাবকেও আট বছরের নির্বাসন দন্ড দিয়েছেন।তারপরই রাজা ভাইয়ের জন্য ব্যাথিত হয়েছেন। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি ভাইকে বলেছেন -

" বৎস, কেবল তোমার দন্ড হইল না,আমারও দন্ড হইল। না জানি পূর্বজন্মে কী অপরাধ করিয়াছিলাম ! যতদিন তুমি বন্ধুদের হইতে দূরে থাকিবে দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন।"

এখানেই শেষ নয়। বিষন্ন, ভারাক্রান্ত রাজা 'নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।" এখানে ঔপন্যাসিক আমাদের জানাচ্ছেন -

"নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলে বেলাকার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, তাহা একেএকে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। এক - একটা দিন, একএকটা রাত্রি তাহার সূর্যালোকের মধ্যে, তাহার তারা খচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।"

এখানে ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত খুব একটা চোখে পড়ে না। এরপর রাজা যখন শুনলেন যে তাঁর নিজের ভাই রাজ সিংহাসন দখলের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করে তাঁর ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে, তাঁরই সঙ্গে যুদ্ধ করতে; তখন রাজা স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেছেন। নক্ষত্ররায়ের সাথে যুদ্ধ তিনি কোন অবস্থাতেই করতে চাননি। করেনওনি। আসলে নক্ষত্ররায়ের প্রতি রাজার স্নেহ ছিল প্রবল। যা গোটা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

(গ) মানবপ্রেম :

রাজা গোবিন্দমাণিক্য এ উপন্যাসে রাজর্ষি। তাঁর মহত্ব এ উপন্যাসের শুরু থেকেই প্রকাশিত। তিনি মানবকল্যানকামী। মানবতাবাদী। মানবপ্রেমিক। রঘুপতি তাঁর সঙ্গে চিরকাল শত্রুতা করে এসেছে। সেই রঘুপতিকে তিনি সহজেই ক্ষমা করেন। এই নক্ষত্ররায়কে প্রেম দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে সুপথে ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। যেদিন রাজ্যছেড়ে চলেযান সেদিন তাঁকে যারা অপমানে অপমানে বিদ্ধ করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। রাজ্য ছেড়ে তিনি সর্বদা মানবকল্যানে নিজেকে নিয়োজত করে রেখেছেন। মগ শিশুদের পাঠ দানের জন্য পাঠশালা খুলেছেন। এমনকি আলম্খাল গ্রামের যাদবের ছেলের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য শাল তুলে দিলেন যাদবের হাতে। যাদব গোবিন্দমাণিক্যকে তা নিজের হাতে ছেলেকে দিতে বললে তিনি বলেন -

> "না, আমি দিব না, তুমি দাও। আমি দিলে কোনো ফল নাই। আমার নাম করিয়ো না। আমি কেবল তোমার ছেলের মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া চলিয়া যাইব।"

এমন মহত্ব কোথায় মেলে ! তিনি শত্রুর প্রতি অপ্রসন্ন হল না। সর্বদা মানুষের মঙ্গল চিন্তায় , মঙ্গলকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখেনি।

(ঘ) নির্লোভ মানসিকতা :

গোবিন্দমাণিক্য আপাদমস্তক এক আদর্শ চরিত্র। স্বভাবতই নির্লোভ চরিত্রের বড় প্রমাণ। তিনি সিংহাসন, ঐশ্বর্য সবই এক মোহহীন দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। কাজেই তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এগুলির লোভ কাটিয়ে কষ্টকর জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেওয়ায়। বনবাসে আরাকানপতি তাঁকে রাজসভার পূজনীয় অতিথি করে রাখতে চান কিন্তু তিনি তা বিনয়ের সাথে ত্যাগ করেছেন।কূটীর নির্মাণ করে থেকেছেন, এমনকি নক্ষত্ররায়ের মৃত্যুর পর ত্রিপুরা থেকে দূত এসে তাঁকে রাজপদে ফিরেযাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেও তিনি তাপ্রাথমিক ভাবে নিতে অস্বীকৃত হন। এ সবই তাঁর নির্লোভ মানসিকতার পরিচায়ক।

(ঙ) কূটনৈতিক বুদ্ধিদীপ্ততা :

রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে যারা অতিসরল বুদ্ধির একজন মানুষ ভাবেন তার আর একটু ভেবে দেখতে পারেন যে কেন নক্ষত্ররায়কে রঘুপতির কাজের খতিয়ান আনতে বলেন আর কেনই বনের মধ্যে নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে বলেন। এর মধ্যে কি কোন গোপন পরিকল্পনা ছিল ?একবার ঘটনাক্রম দেখে নেওয়া যাক। প্রথম ঘটনা হ'ল একদিন গোবিন্দমাণিক্য জয়সিংহ রাজাকে এসে জানিয়ে যায় নক্ষত্ররায় রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। একথা

শুনে গোবিন্দমাণিক্য মর্মাহত হন ঠিকই কিন্তু তাকে মোকাবিলা করবার পরিকল্পনাও করেন। একদিন রাজা পরিকল্পনা করে নক্ষত্ররায়কে গোমতী তীরে নির্জন অরণ্যে বেড়াতে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রথমে নক্ষত্ররায়ের কাছে জানতে চান, যে সে রাজকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে কিনা। একথা বলে নক্ষত্ররায়কে তার অপরাধের কথা প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দেন। দ্বিতীয়ত তার হাতে তরবারি দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে বলেন। এতে নক্ষত্ররায় এ কাজ কোন ভাবেই করতে পারবে না। এতো কৌশলে নক্ষত্ররায়কে শিক্ষা দেওয়া। এরপর দ্বিতীয় ঘটনা হল একদিন গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবর সাথে খেলছিলেন এমন সময় নক্ষত্ররায় সেখানে এলে গোবিন্দমাণিক্য তাকে বলেন -

> "শুনিয়াছি রঘুপতি ঠাকুর অসৎ উপায়ে প্রজাদের অসন্তোষ উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্য মিথ্যা অবধারন করিয়া আমাকে জানাইবে।"

রঘুপতির সঙ্গে নক্ষত্ররায়ের যোগাযোগ, তাকে রঘুপতির বিরুদ্ধে কাছে নিযুক্ত করেন নক্ষত্ররায়কে। তাতে যদি নক্ষত্ররায় রঘুপতির দুটি ঘটনাই প্রমাণ করে গোবিন্দমাণিক্যের কূটনৈতিক বুদ্ধিদীপ্ততা। আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যতই আদর্শবান চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করুনা কেন, তাঁকে নির্বোধ বানান নি।

সব মিলিয়ে বলা যায় 'রাজর্ষি 'গোবিন্দমাণিক্য এক প্রবল ব্যাক্তিত্বময় পুরুষ। তাঁর হৃদয় উদার। তাঁর ধর্ম হৃদয়ের ধর্ম। তাই কোন বিশেষ মতকে আশ্রয় না করে সকল জীবে সমান দয়া, সমান মমতা তাঁর ধর্মের মূল কথা হয়ে উঠেছে। তাঁর হৃদয়ের গভীরতা ওপর বিস্তৃতি সাগরের মতো তবে তাঁর চরিত্রের বিশেষ বিবর্তন নেই। উপন্যাসের প্রায় আগা-গোড়াই তিনি 'রাজর্ষি' হয়ে রয়ে গেছেন।

রঘুপতি :

'রাজর্ষি' উপন্যাসের সবচেয়ে প্রাণচঞ্চল চরিত্র হ'ল রঘুপতি। তাঁর মধ্যে একাধারে আছে ক্রোধ - ক্ষোভ-প্রতিহিংসা। এরই বৃত্তে ঘোরা ফেরা করেছে তাঁর চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো তাঁর মধ্যে জয়সিংহের প্রতি স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে তবে তা সরলরৈখিক নয়। সে স্নেহ কোমল মধুর প্রশান্ত নয় বরং তা উগ্র ও তীব্র। আমরা রগুপতি দেখি যে তিনি ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকেন কিন্তু তাঁর পূজার মধ্যে ভক্তির ব্যাকুলতা নেই। বরং ধর্মকে, মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ে তিনি ছলনা করেন। দেবী পূজায় তাঁর ভক্তি নেই। মন্দিরের ক্ষমতা সারাদেশের ক্ষমতা থাকবে তাঁর হাতে বিশেষত ধর্মাচরণের প্রশ্নে। সেই জন্যই রাজা গোবিন্দমাণিক্য বলি বন্ধকরার নির্দেশ দিলে তা তাঁর অহংকারে গিয়ে আঘাত করে। তাই তিনি বলেন -

> "মহারাজ, রাজকার্য আপনি ভালো বুঝেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, আমিই আগে জানিতে পারিতাম।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রঘুপতির এ দম্ভ মজ্জাগত। বংশ পরম্পরায় তা বাহিত। যদিও সে দম্ভ বলি বন্ধের নির্দেশকে আটকাতে পারেনি। আসলে চতুর রঘুপতি বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মক্ষেত্রে রাজা হস্তক্ষেপ করলে পুরোহিতের ক্ষমতা খর্ব হবে। সেটা রঘুপপতি প্রবল প্রতিরোধ দিয়ে আটকাতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্র অধিকন্তু ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রেত্র সংঘাতটির সূত্রপাত ঘটে অনিবর্য ভাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হিংসা - অহিংসার দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে এদিকটায় আর বিশেষ নজর দেন নি।

রঘুপতির ধর্মবিশ্বাস হৃদয়ের নিবেদিত অর্ঘ্যের মতো নয়। তা বড়ই বাইরের বিষয়। ধর্মকে ইনি তাঁর সুবিধা মতো ব্যবহার করেছেন। নিজের ক্ষমতা রক্ষার জন্য ধর্মকে তিনি ব্যবহার করে অধার্মিক ভাবনা দিয়ে। আরাধ্য দেবীর বাণী বলে সে নিজেই কথা বলে অন্তরাল থেকে। নিজের পুত্রতুল্য জয়সিংহকে পর্যন্ত তাঁর এভাবে ছলনা করতে আটকায় না। নিজে প্রতিমার মুখ ঘুরিয়ে রেখে প্রজাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে দেবী বিমুখ হয়েছেন তাদের থেকে। এ ধরনের অধর্মকর্ম বিশেষত মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছলনা তিনি এত স্বাভাবিক, সহজ ও বিকারহীন ভাবে করেছেন যে তাঁর নিজের কাছেও নিজের অনুতাপ নেই এ বিষয়ে। অর্থাৎ ধর্ম তিনি মানেই না। ধর্ম নিয়ে তাঁর কোন ভাবনাই ছিল না।

রঘুপতি বরাবরই রাজা গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। সে ষড়যন্ত্র খুবই নীচ এবং হীন। অবশ্য ষড়যন্ত্র তো নীচই হয়। রাজা যখন বলি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন তৎক্ষনাৎ তিনি গৃহবিবাদের পরিকল্পনা করেছেন।নক্ষত্ররায়কে রাজা হবার লোভ দেখিয়ে তার সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ভ্রার্তহত্যায় নক্ষত্ররায়কে প্ররোচিত করেছেন। রঘুপতির মতো চতুর মানুষ নক্ষত্ররায়ের মতো দুর্বল প্রকৃতির লোভসর্বস্ব মানুষের মন খুব ভালোই বুঝতেন। তাই সেই দুর্বল জায়গা দিয়ে তিনি নক্ষত্ররায়কে দুর্বল করার চেষ্টা করলেন। যদি নক্ষত্ররায় রাজহত্যাব ব্যর্থ হন সেজন্য তিনি নিজের পালিত পুত্র জয়সিংহকেও একাজে নিযুক্ত করলেন। পাশাপাশি ধর্মের জিগির তুলে সাধারণ ধর্মান্ধ প্রজাদেরও উত্তেজিত করতে লাগলেন। অর্থাৎ যতরকম ভাবে রাজাকে হত্যার পরিকল্পনা করা যায় তার সবকটি কৌশল তিনি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু কোন পরিকল্পনাই তার সফল হল না। বরং তাঁকে শিশু অপহরণের অপরাধে রাজ্যত্যাগ করে নির্বাসনে যেতে হল।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
86

এবার আসা যাক রঘুপতির বাৎসল্য প্রেমের দিকে। জয়সিংহের প্রতি তার বাৎসল্য ছিল। তবে তা অন্তঃস্রোতা। বাইরে তার প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায় নি। এ্ বাৎসল্যকে রঘুপতি ব্যবহার করেছেন ক্ষমতা -যুদ্ধে সিদ্ধিলাভের কাজে। তাই জয়সিংহের মৃত্যুতে তাঁর যেভাবে ভেঙে পড়ার কথা ছিল তা কিন্তু হয়নি। তাঁর মনেরও বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। বরং প্রতিহিংসা বেড়েছে। আমরা দেখি কেমন ছিল রঘুপতির আচরণ জয়সিংএর মৃত্যুর পর -

"রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন - জয়সিংহকে তুলিবার চেষ্টা

করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। ..... অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল ; ..... প্রভাতে বন হইতে যখন পাখি ডাকিয়া উঠিল, তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।"

এরপর রঘুপতি যা করলেন তা তাঁর স্বভাবের দিক থেকে যথাযথ রাজার হৃদয়ের ধন ধ্রুবকে বলি দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি আবার নক্ষত্ররায়কে নিয়ে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তবে তা সফল হয় না। উল্টে বালক অপহরণ করে বলি চেষ্টা করায় তাঁর ও নক্ষত্ররায়ের নির্বাসন দন্ড হয়। এরপর রঘুপতির আক্রোশ আরো বেড়ে যায় গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি। তাঁর একমাত্র হয়ে ওঠে যে কোন মূলে গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি মোঘল সম্রাট সুজার সহায়তা লাভ করেন। কঠিন কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়। তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান গোবিন্দমাণিক্যের পদচ্যুতি ও জয়সিংহের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া।

উপন্যাসে রঘুপতিই একমাত্র চরিত্র যার বিবর্তণ আছে। উপন্যাসের শুরুতেই রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। তাঁর প্রিয় জয়সিংহের মৃত্যুতে এক চরম আঘাত পান তিনি। এক ধরনের বদল আসে তাঁর দৃঢ়তা প্রমাণিত। তার পর তাঁর উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়। নক্ষত্ররায়কে সিংহাসনে বসান তিনি। গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর তাঁর চরিত্রের এক বিরাট বদল দেখা যায়। নক্রত্ররায় সিংহাসনে বসেই রঘুপতিকে গুরুত্বহীন করে দেন। তাঁর ক্ষমতা খর্ব করেন। তাঁকে আঘাত করেন - অপমান করেন। রঘুপতি অনুভব করেন এ যুদ্ধ - এ লোভ - এ সিংহাসন সকলই ভ্রম। তাঁর বিরাট মানস পরিবর্তন ঘটে যায়। যাঁর সঙ্গে তিনি চিরকাল শত্রুতা করে এলেন তারই পদতলে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নেন তিনি। এঘটনা আমাদের ভাবায় যে, এ বদল রঘুপতির না কি লেখকের উদ্দেশ্য পুরণের জন্য বদল। রঘুপতি বলেন বটে -

"মহারাজ, তোমার সহিত শত্রুতা করিলেও লাভ আছে। তোমার শত্রুতা করিতে গিয়াই তোমার কাছে ধরা পড়িয়াছি, নাহিলে কোনোকালে তোমাকে জানিতাম না।"

কিন্তু একথা পাঠককে কতটা প্রবোধ দেয় সন্দেহ আছে। বোঝা যায় বিশেষ এক মতকে প্রতিষ্ঠা দিতেই লেখক এমন বদল ঘটান, যাইহোক সবমিলিয়ে রঘুপতি এক প্রাণবন্ত, সক্রিয় চরিত্র এ উপন্যাসের।

নক্ষত্ররায় :

নক্ষত্ররায় চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ সফল। এমন নির্বোধ, ফাঁপা মানুষ যেমন হন ঠিক তেমনই রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। এ উপন্যাসের অনেকটা অংশ জুড়ে তার বিচরণ, কিন্তু উপন্যাসের মৌল ভাবনার বাইরের তার অবস্থান থেকে যায়। তার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চরিত্রটি সব সময়ই গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধী হিসেবে উপন্যাসে অঙ্কিত। কিন্তু তার নিজস্ব কোন মতাদর্শ ছিল না। মতাদর্শের সংঘাতও ছিল না। একটা 'Type' চরিত্র হয়ে রয়ে গেছে সে। এই চরিত্রটিকে লেখক কোন আদর্শে আদর্শায়িত করতে চাননি বলে চরিত্রটির স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

নক্ষত্র ভিরু, দুর্বলতা, মেরুদন্ডহীন একজন মানুষ। ব্যক্তিত্বহীন তো বটেই। এমন মানুষের নিজস্ব কোন কণ্ঠস্বর থাকে না। এরও ছিল না। একে যে যেমন চালিত করেছে, তার দ্বারাই সে চালিত হয়েছে। যখন গোবিন্দমাণিক্যের কাছে থাকে তখন তাঁর ব্যাক্তিত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আবার যখন রঘুপতির সান্নিধ্যে আসে তখন তাঁর ব্যাক্তিত্বের প্রভাবে সম্পূর্ণ বশীভূত হব। এদের কারো কথাই নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে সে পরখ করে নেয় নি। অবশ্য সে ক্ষমতা তার ছিল না।

নক্ষত্ররায় ছিল লোভী মানুষ। রাজা হবার লোভ তাকে পেয়ে বসে। সে নিজের সম্বন্ধে ভেবেও দেখেনি যে সে ঐ রাজপদের কতটা যোগ্য। তার যোগ্যতাহীনতা ও লোভ, এই দ্বিবিধ কারণে রঘুপতি তাকে বেধে ফেলে। সে অদৃশ্য জাল ছেঁড়ার ক্ষমতা নক্ষত্ররায়ের ছিল না। তাই ধ্রুবকে অপহরণ করে আনে। রঘুপতি নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য কৌশলে নক্ষত্ররায়কে ব্যবহার করেন।

অন্যদিকে দাদা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি এক ধরণের সশ্রদ্ধ আনুগত্য তার মজ্জাগত ছিল। সে শ্রদ্ধা এমনই যে,গোবিন্দমাণিক্যকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সৈন্য নিয়ে রাজ্যের বাইরে অবস্থান করা কালে বিল্বনের কাছ থেকে দাদার চিঠি পড়ে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে চলে আসতে চেয়েছিল সব ছেড়ে দিয়ে। সে সময় রাজা হবার লোভও তাকে আটকাতে পারছিল না দাদার কাছে আসতে। দাদার ক্ষমা ও স্নেহ পেলে সিংহাসনের লোভও সে অনাবাসে ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু আবার ঐ রঘুপতি তাকে কৌশলে আটকায়।

রাজা হয়ে নক্ষত্ররায় সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কেদারেশ্বরকে অস্বিকার করল। রঘুপতির কর্তৃত্ব কেড়ে ফেলে দিল। লেখক কৌশলে এখানে নক্ষত্ররায়ের স্বাভাবিক বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই নক্ষত্রের কাহিনী বাড়ানোর আর প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। গুজুর পাড়ায় নক্ষত্ররায়ের জীবনের যে অংশ বর্ণিত হয়েছে তাতে তার মধ্যে এক বালকের স্বভাবকে দেখা গেছে। এই বোধহয় আসল নক্ষত্ররায়। যাইহোক নক্ষত্ররায় ইতিহাস সম্মত চরিত্র। কিন্তু লেখক নিজের কল্পনায় তার স্বভাবকে অঙ্কন করেছেন। এমনিতেই উপন্যাসের উদ্দেশ্যের নিরিখে নক্ষত্ররায়ের বিশেষ ভূমিকা নেই যা আছে তা একেবারে শেষে রঘুপতির মানস পরিবর্তনের জন্য। নক্ষত্ররায়ের অপমানই তাকে বদলে দেয়। হয়তো এটুকু প্রাসঙ্গিকতা আছে নক্ষত্ররায় চরিত্রের। সবমিলিয়ে চরিত্র হিসেবে নক্ষত্ররায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা সার্থক চরিত্র।

জয়সিংহ :

এই উপন্যাসে জয়সিংহ চরিত্রটি সুঅঙ্কিত। রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে -

> "ভুবনেশ্বরী - দেবী - মন্দিরের ভৃত্য জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, ক্ষত্রিয়। তাঁহার বাপ সুচেত সিংহ ত্রিপুরায় রাজবাটীর একজন পুরাতন ভৃত্য ছিলেন। সুচেত সিংহের মৃত্যুকালে জয়সিংহ নিতান্ত বালক ছিলেন। এই অনাথ বালককে রাজা মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করেন। জয়সিংহ মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির দ্বারাই পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন।"

এই জয়সিংহ আমৃত্যু রঘুপতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি। তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব কাজ করেছে তার মধ্যে বিশেষ কোন বিকাশ নেই। তবে তার অন্তদ্বন্দ্বের জটিলতা আছে, আছে ট্র্যাজিক পরিণতি। তার ট্র্যাজেডি কিছুতা ইউরোপীয় ধরনের। রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তা মুলত রাজার নিজস্ব চারিত্রিক উৎকর্ষতার কারণ। তার পালক পিতা রঘুপতির প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তার মধ্যে যতটা অভ্যেস আছে, ততটা ভক্তি ও ভালোবাসা নেই। বাহ্যত ধার্মিক ও কালীভক্ত রঘুপতির রাজার নির্দেশে বলি বন্ধ করার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ, তাতে সে সহমত। কিন্তু রাজহত্যার উদ্দেশ্যে রঘুপতির যে গোপন ষড়যন্ত্র, তাএই জয়সিংহ আদর্শগত সংকটে পড়েছে। একেই রাজহত্যা, তাই আবার ভাইয়ের হাতে, এতে তার সচেতন মানবিক বোধ ও ন্যায় - নীতি বিদ্রোহ করে উঠেছে। জয়সিংহ তাই রঘুপতিকে বলেছে -

> "গুরুদেব, এমন ভয়ানক কথা কখন ও শুনি নাই। আপনি মায়ের সম্মুখে, মায়ের নাম করিয়া ভাইকে দিবা ভ্রাতৃ হত্যার প্রস্তাব করিলেন, আর আমাকে তাই দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল।"

জয়সিংহের কাছে এই ষড়যন্ত্র শুধু অস্বাভাবিকই নয়, পাপও বটে। তার কারণ গোবিন্দ মাণিক্যের মত একজন সদাশয়, পরম নীতিবান একজন মানুষকে হত্যার পরিকল্পনা, জয়সিংহের সুস্থ চিন্তনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। রঘুপতি জয়সিংহকে হত্যার সম্বন্ধে অন্যতর এক শিক্ষা দিয়ে হত্যাকে একটা মাণ্যতা দিতে চেয়েছেন। তাছাড়া দেবী প্রতিমার নামে মিথ্যাচার, নিজের হাতে প্রতিমার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এসবই জয়সিংহ তার নিষ্পাপ ভাবনা দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রঘুপতির প্রতি তার শ্রদ্ধা, ভক্তি ভেঙে গেছে এ ঘটনাতে। তবুও পিতার মমতায় শিশুকাল হতে পালণ করেছেন যে গুরু, তার কাছে রাজরক্ত আনার প্রতিজ্ঞা করতে হয় তাকে। একদিকে সত্যনিষ্ঠ রাজা গোবিন্দমাণিক্য, অন্যদিকে পালক পিতা রঘুপতি - এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে তাকে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর গতি থাকে না। ফলে নিজের জীবন দিয়ে তাকে চিত্তের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে চিরকালের

টিপ্পনী

শান্তি পেতে হয়। কর্তব্য বোধের সঙ্গে রাজভক্তির ও হৃদয়বৃত্তির বিরোধ তার তরুণ অপাপ বিদ্ধ হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে তার আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া।

উপন্যাসে জয়সিংহের চরিত্র মোটামুটি সুপরিকল্পিত। কিন্তু তার অর্ন্তদ্বন্দ্বের ব্যাপ্তি নেই। নেই দুদিকের টানে সমান জোর। রঘূপতির প্রতি তার আকর্ষন পুরোনো শ্রদ্ধার অবশেষ মাত্র। রাজার ধর্মীয় প্রথা - বিরোধী আচরণও তার গভীর ভক্তিকে বিশেষ বিচলিত করেনা। ফলে চরিত্রটি এখানেই বাস্তুতা থেকে খানিকটা দূরে সরে যায়। তার জীবনে ট্রাজেডিও খুব প্রকট নয়। তার 'Doing' এবং 'Suffering' বিস্তৃত নয়। কাজেই ট্রাজেডির গভীরতা প্রাপ্ত হয়নি চরিত্রটিতে।

টিপ্পনী

বিল্বন ঠাকুর :

'রাজর্ষি' উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ উনত্রিশতম অধ্যায়ে তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ বিল্বন নামে এক মহাপুরুষের আবতাড়না ঘটিয়েছেন। লেখক তার সম্বন্ধে বলেছেন -

> "বিল্বন কোন দেশীলোক কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বলীদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া এক প্রকার নূতন অনুষ্ঠানে দেবির পূজা করিয়া থাকেন - প্রথম প্রথম তাহাতে লোকেরা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এখন সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। বিশেষত বিল্বনের কথায় সকলে বশ। বিল্বন সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন, এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য ঘটিয়া যায়। বিপদে আপদে সকলেই তাঁহার পরামর্শ মতে কাজ করে - তিনি মধ্যবর্তী হইয়া কাহারও বিবাদ মিটাইয়া দিলে বা কিছুর মীমাংসা করিয়া দিলে তাহার উপরে আর কেহ কথা কহে না।"

অল্পদিনের মধ্যেই বিল্বন গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁর সকল প্রজাদের মন জয় করে ফেলেন। সকলের সাথে মেশবার এক সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর। শিশুদের কাছে ও তিনি সমান জনপ্রিয়। তাদের মনোরঞ্জন করতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। ছেলেরা বিল্বন ঠাকুরকে দেখলেই ঘিরে ধরত। তাঁর কাছ থেকে গল্প শোনার আনন্দে গোল বাঁধিয়ে দিত।

স্ব-সহায়ক সামগ্রী
90

> "বিল্বন ঠাকুর এক-একদিন অপরাহ্নে রাজ্যের ছেলে জড়ো করিয়া, তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ন, মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শুনাইতো।"

বিল্বন ঠাকুরের মানব প্রেমের দিকটি রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। তিনি সর্বদা রাজ্যবাসীর সেবাব নিয়োজিত। কোন ভয় ডর নেই তাঁর চরিত্রে। লক্ষন রায় ত্রিপুরা আক্রমণ করলে তিনিই ঘুরে ঘুরে সৈণ্য সংগ্রহ করেন।

যুদ্ধে গোবিন্দমাণিক্যের নিরাসক্ততাকে তিনি সমর্থন করেন না। কেননা তিনি মনে করেন, ধর্মযুদ্ধে কোন পাপ নেই। শুধু তাই নয়, একজন সেনাপতির যা কাজ রাজপুরোহিতের হয়েও বিল্বন তাই করলেন। একদিকে যুদ্ধের পরিকল্পনা করলেন, অন্যদিকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব নিয়ে নক্ষত্র রায়ের কাছে ও গেলেন। রাজা যুদ্ধ কিছুতেই সম্মত হলেন না দেখে বললেন - "অসহায় প্রজাদিগকে পরহস্তে ফেলিয়া দিআ তুই পলায়ন করিবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কোন মতেই প্রসন্ন মনে বিদায় নিতে পারি না।"

এর পর তো রাজা বনে চলে যাণ। বিল্বনও ত্রিপুরা ছেড়ে নোয়াখালির নিজামৎ পুরে গিয়ে বাস করতে শুরু করেন। সেখানে ভয়ঙ্কর মারি-মরক দেখা দিলে বিল্বন ঠাকুর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সেবা করেন। তাতে সকলের গুনমুগ্ধ হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ এই বিল্বণের মধ্যদিয়ে একজন দেশপ্রাণ কর্মযোগী মানুষের ছবি তুলে ধরেছেন, যিনি নির্লোভ, নির্মোহ, পৃথিবীতে থেকেও তিনি তার উর্ধ্বে বাস করেন। তবে এই চরিত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় মহৎরূপে তুলে ধরতে চেয়েছেন, যার ফলে বিল্বন আদর্শগত চরিত্র হয়েউঠেছ, বাস্তবের সঙ্গে যার প্রায় মিল নেই বললেই চলে।

টিপ্পনী

আদর্শপ্রশ্নাবলী

১। 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

২। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের গোত্র বিচার করো।

৩। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৪। গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র আলোচনা করো। এ উপন্যাসের নায়ক কি তিনি ? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৫। রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের বিপরীত ধর্মী চরিত্র ব্যাখ্যা করো।

৬। নক্ষত্ররায় কি 'টাইপ' চরিত্র ? তার চরিত্র পর্যালোচনা করে তা প্রমাণ করো।

৭। জয়সিংহ ও বিল্বন চরিত্র দুটি রচনা করতে গিয়ে লেখক কিছুটা বাস্তবের থেকে দূরে সরে গেছেন - আলোচনা করো।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। রবীন্দ্রজীবনী - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

২। রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা - শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস - উকুমার সেন।

৫। রবীন্দ্রনাথ - সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৬। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়

৭। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ - নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়।

৮। রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথমপর্যায় - জ্যোর্তিময় ঘোষ।

৯। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (২য় খন্ড) - ক্ষেত্রগুপ্ত।

টিপ্পনী